সেবা স্তর

SERVICE STAGE

(রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম)

বাংলাদেশ স্কাউটস

BANGLADESH SCOUTS

সেবা স্তর

(রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম)

স্বত্ব	ঃ	বাংলাদেশ স্কাউটস
গ্রন্থনায়	ঃ	প্রশিক্ষণ স্তর ও সেবা স্তর টাস্কফোর্স
সম্পাদনা	ঃ	প্রোগ্রাম বিভাগ, বাংলাদেশ স্কাউটস
প্রকাশনা	ঃ	ব্যবস্থাপনা কমিটি, জাতীয় স্কাউট শপ
প্রথম প্রকাশকাল	ঃ	এপ্রিল ২০১৫
দ্বিতীয় প্রকাশকাল	ঃ	ফেব্রুয়ারি ২০১৯
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও ডিজাইন	ঃ	স্কাউটার মোঃ মাইনুল হক দিগন্ত মুক্ত স্কাউট গ্রুপ
মূল্য	ঃ	২০ (বিশ) টাকা

মুদ্রণে ঃ মাহির প্রিন্টার্স, ২২৪/১ ফকিরাপুল, ঢাকা।

মুখবন্ধ

স্কাউটিং বিশ্বব্যাপী একটি শিামূলক যুব আন্দোলন। শিশু কিশোর যুব বয়সী বালক বালিকাদের অবসর সময়কে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগিয়েসুস্থ শরীর, সুন্দর মন, সু-শৃঙ্খল জীবন ও ধর্মীয় চেতনাবোধ তৈরীর লক্ষ্যে স্কাউটিং অনন্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এই আন্দোলনে শিশু, কিশোর ও যুবদের জন্য রয়েছে বয়স উপযোগী আলাদা আলাদা সুবিন্যস্ত প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামের বিষয়সমূহ সহজে আয়ত্ত ও অনুশীলন করার জন্য প্রকাশ করা হয়েছে শাখা ও স্তরভিত্তিক আলাদা আলাদা বই। রোভারিং এর সেবা স্তর বইয়ের বিষয়গুলো যথাযথভাবে অনুশীলন করে রোভার স্কাউটরা নিজেদেরকে প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনের লক্ষ্যে যোগ্য করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে বলে আশা করি। কাজেই রোভার স্কাউটদের জন্য এই বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

স্কাউটিং মূলতঃমুক্তাঙ্গনের শিক্ষা। প্রকৃতির উদার পরিবেশে আনন্দময় খেলাধুলা ও শিক্ষার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তা জীবন গঠনে সুন্দরভাবে কাজে লাগে। সেবাস্তর বইটির বিষয়বস্' অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদেরকে আরো দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। এভাবে একজন রোভার স্কাউট সেবার মূলমন্ত্র অনুসরণে জীবন গঠনে তৎপর হয়ে জাতির যোগ্য নাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে।

কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম প্রণয়ন এবং বই প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যবাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রাক্তণ জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক, জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, জনাব মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া, জনাব মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান এবং সকল জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম), রোভার প্রোগ্রাম টাস্কফোর্সের সদস্যব"ন্দ, প্রোগ্রাম বিভাগের ডেস্ক কর্মকর্তা সহ সকলের নিকট ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। শাখা ভিত্তিক প্রোগ্রাম আধুনিকায়ন ও বইসমূহ হালনাগাদ করার লক্ষ্যে বর্তমান প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান এর দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রোগ্রাম বিভাগের কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল করেছে এবং কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

রোভার স্কাউট ইউনিটে এ বইয়ের বিষয়গুলো অনুশীলন ও ব্যক্তি জীবনে বাস্তবায়নের জন্য রোভার স্কাউট এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিট লিডারবৃন্দকে অনুরোধ জানাচ্ছি। রোভার প্রোগ্রাম চলমান প্রক্রিয়া বিধায় আগামীতে রোভার প্রোগ্রামকে আরো বেশী যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে ইউনিট লিডারসহ সকল স্তরের বয়স্ক নেতাদের নতুন নতুন চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। বইসমূহ আধুনিকায়নে সকলের পরামর্শ সাদরে গ্রহণীয়। সেবা স্তর বইটির পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রোগ্রাম বিভাগ পৃথক টাস্কফোর্স গঠন করে। টাস্কফোর্সের সকল সদস্যবৃন্দের সক্রিয় অবদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আশাকরি সেবা স্তর বইটি দেশে রোভারিং কার্যক্রমকে আলো বেশী গতিশীল করবে এবং যোগ্য নাগরিক তৈরিতে একজন রোভার স্কাউটকে সঠিক পরিচালিত হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করবে।

(মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন)
জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)
বাংলাদেশ স্কাউটস।

পটভূমি

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল (১৮৫৭-১৯৪১) স্কাউটিং কার্যক্রম শুরু করার পূর্বেই স্কাউট বয়সী ছেলেমেয়েদের চাহিদা বিবেচনা করে কিছু বই প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি পূর্বে প্রকাশিত বইসমূহের সহায়তায় বয়সভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করে স্কাউটিংয়ের বিভিন্ন শাখার অর্থাৎ কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট শাখার জন্য পৃথক কার্যক্রম নির্ধারণ করে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের ভিত্তিতে স্বতন্ত্রভাবে কয়েকটি বই রচনা করেছেন। এই বই সমূহে স্কাউটিং কার্যক্রমে আকৃষ্ট হওয়ার জন্য প্রচারণামূলক দিক নির্দেশনাসহ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষণীয় এবং করণীয় কার্যক্রমের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে স্কাউটিংয়ের দ্রুত প্রসার এবং দীর্ঘস্থায়ীত্বের জন্য এখনও লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের লেখা আকর্ষণীয় বইগুলোর কোনো বিকল্প নেই।

স্কাউট আন্দোলন শুরুর আগে ও পরে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট ও অ্যাডাল্ট লিডারদের জন্য যে সমস্ত বই প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বইগুলো নিম্নরূপ ঃ-

এইডস টু স্কাউটিং	-১৮৯৯	এ বই পড়েই অনেকে স্কাউটিংয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে
স্কাউটিং ফর বয়েজ	-১৯০৮	স্কাউট শাখার জন্য
উলফ কাব হ্যান্ডবুক	-১৯১৬	কাব স্কাউট শাখার জন্য
এইডস টু স্কাউট মাস্টারশীপ	-১৯২০	অ্যাডাল্ট লিডারদের জন্য
রোভারিং টু সাকসেস	-১৯২২	রোভার স্কাউট শাখার জন্য

দীর্ঘদিন ধরে স্কাউটদের জন্য এ বইগুলো প্রচলিত থাকলেও বিবর্তন এবং যুগ ও দেশের চাহিদার প্রেক্ষিতে স্কাউটিংয়ে নতুন নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে। আর সেসব নিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ বইপত্রও রচিত হয়েছে এবং এখনও তার অনুসরণ চলছে।

বৃটিশ শাসনামলে ১৯২০ সালে অবিভক্ত ভারতের এই অঞ্চলে স্কাউট আন্দোলন শুরু হয়। তখন স্কাউটিং কার্যক্রমে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল রচিত স্তর ভিত্তিক বইগুলি ব্যবহার করা হতো। এই স্তর ভিত্তিক বইগুলো হচ্ছে-টেন্ডার ফুট, সেকেন্ড ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস। এই স্তর ভিত্তিক বইসমূহে বিভিন্ন পারদর্শিতা ব্যাজের করণীয় উল্লেখ থাকলেও পরবর্তীতে প্রতিটি ব্যাজের জন্য বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পৃথক পৃথক বই রচনা করা হয়।

বৃটিশ শাসনামলের অবসানের পর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান জন্মের সুচনা থেকে এই অঞ্চলে স্কাউট আন্দোলন নতুনভাবে সংগঠিত হয়। সেই সময়ের প্রথম পর্যায়ে বৃটিশ আমলে ইংরেজিতে প্রকাশিত স্তর ভিত্তিক বইগুলি ব্যবহৃত হলেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্কাউটিংয়ের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজিতে লেখা বইগুলি বাংলায় অনুবাদ করা হয়।

এই প্রক্রিয়ায় টেন্ডার ফুট বইটিকে 'কচি কদম', সেকেন্ড ক্লাস বইটিকে 'দ্বিতীয় কদম' এবং ফাস্ট ক্লাস বইটিকে 'দৃপ্ত কদম' নামে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়। এই অনুবাদের ধারাবাহিকতায় স্কাউটার মরহুম এম ওয়াজেদ আলী ব্যাডেন পাওয়েল এর লেখা 'স্কাউটিং ফর বয়েজ' বইটি 'বালকদের স্কাউট শিক্ষা' নামে ১৯৫৭ সালে বাংলায় অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে বই অনুবাদ কার্যক্রম একটি চলমান কর্মসূচিতে রূপ লাভ করে। অনুবাদের চলমান কর্মসূচির অংশ হিসেবে তরিকুল আলম ও জহুরুল আলম ১৯৫৯ সালে 'কাব স্কাউট হ্যান্ডবুক' বইটিকে 'কাব স্কাউট শিক্ষা' নামে বাংলায় অনুবাদ করেন। স্কাউট শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব এবং ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য গৃহিত এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্কাউটিংয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইংরেজিতে লেখা বিভিন্ন বিষয়ের বইগুলিকে বাংলায় রূপান্তর করা হয়।

স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে এদেশে স্কাউটিং কার্যক্রম সংগঠিত হতে থাকে এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে স্কাউট আন্দোলন পূর্নগঠিত হলে স্কাউটিংয়ের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্কাউটিং সম্পর্কিত পাঠ্য বইয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশে নতুনভাবে শুরু করা রোভারিং কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদানের জন্য ১৯৭৩ সালে স্কাউটার আ স মু মাকসুদুর রহমান 'রোভার পরিকল্পনা' নামে বইটির পান্ডুলিপি রচনা করেন। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে এদেশে স্কাউটিং কার্যক্রমের নীতি, পদ্ধতি ও পরিচালনার জন্য পি.ও.আর (নীতি, সংগঠন ও নিয়ম) নামের বইটি বাংলাদেশের অভ্যুদ্বয়ের পরে কয়েক বছর ব্যবহৃত হওয়ার পর ১৯৭৫ সালে "বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি" নামে প্রথমবারের মতো গঠনতন্ত্র প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৮৪ সালে "গঠন ও নিয়ম" নামে নতুনভাবে নীতি পদ্ধতির বইটি প্রকাশ করা হয়। স্বাধীন দেশে স্কাউটিং কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচলিত স্তরভিত্তিক বইসমূহের তথ্য এবং বাস্তব চাহিদা নিরূপণ করে ১৯৭৮-৭৯ সালে তৎকালীন প্রধান জাতীয় কমিশনার মরহুম নূরুলিসলাম শামসের উদ্যোগে নতুন স্কাউট প্রোগ্রাম নির্ধারণ করে ঐ প্রোগ্রামের আলোকে বয় স্কাউট শাখার বই লেখা হয়। প্রোগ্রাম অনুসারে বইগুলির পান্ডুলিপি প্রণয়ন করেন তৎকালীন রোভার স্কাউট এবং বর্তমানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার মোঃ আবুল কালাম আজাদ, তৎসময়ে রোভার স্কাউট এবং বর্তমানে জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) মুঃ তৌহিদুল ইসলাম ও তৎকালীন রোভার স্কাউট মোজাহারুল হক মঞ্জু। এসব পান্ডুলিপির ভিত্তিতে নিম্নের শাখাভিত্তিক বইসমূহ প্রকাশিত হয়।

সদস্য ও স্ট্যান্ডার্ড	১৯৭৯
প্রোগ্রেস	১৯৮০
সার্ভিস	১৯৮১

এই স্তর ভিত্তিক বইসমূহে স্কাউটদের জন্য পালনীয় পারদর্শিতা ব্যাজের প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে স্কাউটরা স্ব স্ব স্তরের প্রোগ্রাম অনুসরণ করে ব্যাজ অর্জন করতে সক্ষম হয়। পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ১৯৮৭ সালে বয় স্কাউট শাখার স্তরভিত্তিক বইসমূহকে একত্রিত করে 'বয় স্কাউট' নামে এটি অখন্ড বই প্রকাশ করা হয়। এই অখন্ড বইটির মধ্য দিয়ে স্কাউটদের নিকট ক্রমোন্নতিশীল স্কাউট প্রোগ্রাম অনুসরণ অধিকতর সহজ করা হয়েছিল। ১৯৮৫ সালে স্কাউট শাখার প্রোগ্রামে আবার পরিবর্তন আনা হয় এবং পারদর্শিতা ব্যাজের কর্মসূচিকে নতুন ভাবে বিন্যস্ত করা হয়। এই পর্যায়ে স্কাউট প্রোগ্রামকে আরও বেশি কার্যকরী করার জন্য স্তর ভিত্তিক আলাদা আলাদাভাবে বই প্রকাশ করা হয়। এই প্রকাশনার ক্ষেত্রে এক সময়ের অত্যন্ত দক্ষ স্কাউট ও রোভার স্কাউটগণ স্ব স্ব অবস্থানে থেকে বই সমূহ প্রকাশে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন, তার বিবরণ নিম্নরূপঃ

সদস্য ব্যাজ	আরিফ বিল্লাহ আল মামুন	১৯৯৭
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ	মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান	১৯৯৫
প্রোগ্রেস	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	১৯৯৬
সার্ভিস ব্যাজ	মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া	১৯৯৬

স্কাউট প্রোগ্রাম নবায়নের পাশাপাশি ১৯৯৫ সালের গোড়ার দিক থেকে কাব স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। কাব স্কাউট ও রোভার স্কাউট শাখার স্তর ভিত্তিক বইসমূহের পান্ডুলিপি প্রণেতা ও প্রকাশ সময় নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

সদস্য ব্যাজ	মোঃ আব্দুল ওয়াহাব	১৯৯৫
তারা ব্যাজ	মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন	১৯৯৬
চাঁদ ব্যাজ	রওশন আরা বিউটি	১৯৯৭
চাঁদ তারা ব্যাজ	মোছাম্মৎ জোহরা আক্তার	১৯৯৭
রোভার সহচর	মোফাখখার হোসেন	১৯৯৭
সদস্য স্তর	মোফাখখার হোসেন	১৯৯২
প্রশিক্ষণ স্তর	মোঃ আরিফুজ্জামান	১৯৯৫
সেবা স্তর	আদিল হায়দার সেলিম	১৯৯৬

এছাড়া রোভার স্কাউটদের জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধশালী করার লক্ষ্যে ২০০৪ সালে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল রচিত 'রোভারিং টু সাকসেস' বইটি প্রবীণ লিডার ট্রেনার এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) প্রফেসর মাহাবুবুল আলম বাংলায় অনুবাদ করেন। স্কাউট আন্দোলনের পরিবর্তনের এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক চলমান প্রোগ্রামকে যুগের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চাহিদা অনুভূত হওয়ায় স্কাউট ও রোভার স্কাউট শাখায় ব্যবহৃত প্রোগ্রামকে

আরও বেশি আধুনিকীকরণ করার জন্য ২০০০ সালে তৎকালীন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীকের নেতৃত্বে পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ সময় স্কাউট প্রোগ্রাম ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের জন্য জুবায়ের ইউসুফের তত্ত্বাবধানে 'স্কাউট প্রোগ্রাম টাস্কফোর্স' এবং মোঃ আরিফুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে 'রোভার প্রোগ্রাম টাস্কফোর্স' নামে দুটি পৃথক টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্স দু'টির মাধ্যমে উভয় শাখায় প্রচলিত প্রোগ্রামকে যুগোপযোগী করার জন্য যাত্রা শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে তৎসময়ের জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) মুঃ তৌহিদুল ইসলাম, মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া ও কাজী নাজমুল হক প্রোগ্রাম নবায়নে টাস্কফোর্স দু'টিকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করেন। এই প্রক্রিয়ায় রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণে রোভার প্রোগ্রাম টাস্কফোর্সের সদস্য সচিব হিসেবে প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট মোহাম্মদ জামাল হোসেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই টাস্কফোর্স দু'টি প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের জন্য ২০০১ সাল থেকে শুরু করে ২০০৩ সাল পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়ার্কশপ, সেমিনার, আলোচনা পর্যালোচনাসহ জাতীয় ও অঞ্চল পর্যায়ে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে শাখা ভিত্তিক প্রোগ্রাম নবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রচলিত প্রোগ্রামে সংযোজন, বিয়োজন, সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করে স্কাউট প্রোগ্রাম এবং রোভার স্কাউট প্রোগ্রামকে যুগের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোতে পূর্ণতা দেয়া হয়। এই কাঠামোগত পূর্ণতা তৈরির পর উভয় শাখায় অন্তর্ভূক্ত নতুন নতুন বিষয়বস্তু ও ব্যাজের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রণয়নের জন্য পদক্ষেপ গৃহিত হয়। এই কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে কাব স্কাউট ও স্কাউট শাখায় প্রচলিত প্রোগ্রামের ভিত্তিতে প্রণয়নকৃত বই সমূহকে আরও বেশি আকর্ষণীয় ও কার্যকর করার লক্ষ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। এই বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক পরিমার্জিত আকারে প্রস্তুতকৃত বইসমূহ প্রকাশনায় তৎকালীন প্রধান জাতীয় কমিশনার মুহঃ ফজলুর রহমান সার্বিক সহায়তা দান করেন এবং বর্তমান প্রধান জাতীয় কমিশনার ও তৎসময়ের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ আবুল কালাম আজাদ বইগুলি সমৃদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন।

২০০৪ সালে প্রচলিত বইসমূহ পরিমার্জিত আকারে প্রকাশের কিছুদিন পরেই ২০০৩ সালে প্রণয়নকৃত স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রামের কাঠামো দু'টিকে পুনরায় যাচাই বাছাই করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই যাচাই বাছাইয়ের জন্য ২০০৪-২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত ইয়ুথ ফোরাম এবং জাতীয় ওয়ার্কশপসহ আয়োজিত আলোচনাসমূহ বর্তমান প্রধান জাতীয় কমিশনার ও তৎসময়ের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ আবুল

কালাম আজাদ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাঁকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করেন তৎসময়ের প্রোগ্রাম বিভাগে দায়িত্ব পালনকারী জাতীয় উপ কমিশনার সরোয়ার মোঃ শাহরিয়ার, মোঃ মাহমুদুল হক এবং মোঃ মনিরুল ইসলাম খান। এই পর্যায়ে প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহ সমন্বিত করে ২০০৯ সালে স্কাউট ও রোভার স্কাউট শাখার প্রোগ্রাম চূড়ান্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই উদ্যোগকে কার্যকরী করার লক্ষ্য নিয়ে স্কাউট ও রোভার স্কাউট শাখায় প্রোগ্রাম বই প্রকাশের উদ্দেশ্যে জুবায়ের ইউসুফ ও মোঃ আরিফুজ্জামানকে পৃথকভাবে পুনরায় আহবায়কের দায়িত্ব দিয়ে প্রোগ্রাম বই প্রকাশের জন্য দু'টি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্স দু'টিতে সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে স্কাউটার মোঃ মাইনুল হক ও স্কাউটার খন্দকার সাদিদ সাঈদ। টাস্কফোর্সের একাধিক পর্যালোচনা বৈঠক ও জাতীয় সদর দফতর এবং জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চূড়ান্ত পর্যালোচনা ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের কাজটি সম্পন্ন হয়। প্রায় ২৫ বছরের ব্যবহৃত স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম নবায়নের জন্য ২০০৩ সাল থেকে শুরু ২০০৯ সাল পর্যন্ত গৃহিত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য ২০০৯ সালের প্রথম দিকে জাতীয় প্রোগ্রাম কমিটির তৎকালীন সভাপতি মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর এই গৃহিত পদক্ষেপের ফলে জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া এর উপস্থাপনায় ০৯ আগস্ট ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠেয় জাতীয় কাউন্সিলের ৩৮তম বার্ষিক অধিবেশনে উভয় শাখার প্রোগ্রাম অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে এই বইগুলোর পান্ডুলিপি তৈরির জন্য আলাদা আলাদা টাস্কফোর্সকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সেবা স্তর বইটি প্রকাশনার জন্য পান্ডুলিপি প্রণয়ন করেন স্কাউটার শেখ জাভেদ মোজাক্কের-উর-রহমান (শোভা), প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট এবং স্কাউটার ফরহাদ হোসেন, প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট। নবায়নকৃত স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম জাতীয় কাউন্সিলে অনুমোদনসহ প্রণয়নকৃত প্রোগ্রামের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত এই বই প্রকাশে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে প্রধান জাতীয় কমিশনার মোঃ আবুল কালাম আজাদ প্রোগ্রাম সংক্রান্ত কর্মকান্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধিকে আরও বেশী জোরদার করেছেন।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
০১	সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন	১০
০২	বাংলাদেশে জাতিসংঘ এবং শাখা সমূহের কার্যাবলী	২৪
০৩	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	২৮
০৪	বাংলাদেশে কাজ করে এমন অন্ততঃ একটি আন্তর্জাতিক যুব সংস্থা	৩১
০৫	সার্ক সহ অন্য যে কোন একটি আঞ্চলিক জোটের গঠন ও কার্যাবলী	৩৫
০৬	এপি রিজিওন ছাড়া বিশ্ব স্কাউট সংস্থাভূক্ত ২ অঞ্চলের স্কাউটিং আছে এমন দুইটি দেশ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন	৩৮
০৭	রেকর্ড সংরক্ষণ	৪১
০৮	ব্যবহারিক দক্ষতা	৪১
০৯	পরিভ্রমণকারী ব্যাজ অর্জন	৪৩
১০	কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন	৪৪
১১	যে কোন একটি বিষয়ে পরিমিত জ্ঞানার্জন	৪৭
১২	রোভার স্কাউটদের জন্য নির্বাচিত গান	৪৯
১৩	ধর্মীয় নিয়মাবলী	৪৯
১৪	স্কাউটিং ও সেবা কার্যক্রম	৫০
১৫	সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন	৫১
১৬	স্বাস্থ্য পরিচর্যা	৫৪
১৭	স্বনির্ভর ব্যাজ ও স্কাউট কর্মী ব্যাজ	৬৭

০১. সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ।

বাংলাদেশ সরকার

সরকার হচ্ছে এমনই একটি সমষ্টিগত সংগঠন যা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত এই সংগঠন রাষ্ট্রের পক্ষে আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে নির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে। এই নীতিমালাসমূহ হচ্ছে সংবিধান। বাংলাদেশের সংবিধানের খসড়া ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত হয় বিল আকারে। এটি ০৪ নভেম্বর পাশ হওয়ার প্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে "বাংলাদেশের সংবিধান" হিসাবে কার্যকর হয়। ৪টি মূলনীতি সম্বলিত এই সংবিধান ১৫৩টি অনুচ্ছেদ, ১১টি ভাগ, ১টি প্রস্তাবনা এবং ৪টি তফসিলসহ একটি দুষ্পরিবর্তনীয় লিখিত দলিল, যা একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ ছাড়া সংশোধন করা যায় না। গত ৪০ বছরে বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫টি সংশোধনী যুক্ত করা হয়। যা ১ম, ২য়................. সংশোধনী নামে পরিচিত। বাংলাদেশে বর্তমানে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি বিদ্যমান। সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশের সরকারের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল।

সরকারের বিভাগসমূহ (Organs of Governmets)

রাষ্ট্রের ইচ্ছা বাস্তবায়িত করার জন্য রাষ্ট্রকে মূলতঃ তিনটি কার্য সম্পাদন করতে হয়। যথা- আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা ও বিচার কার্য সম্পাদন। এ তিনটি কার্যের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে যথা-

(১) আইন বিভাগ (২) শাসন বিভাগ ও (৩) বিচার বিভাগ।

- আইন বিভাগের মূল কাজ আইন প্রণয়ন করা ও প্রচলিত আইনের সংশোধন করা।
- শাসন বিভাগের মূল কাজ আইন বলবৎ করা ও শাসন কার্য পরিচালনা করা এবং আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করা।
- বিচার বিভাগের মূল কাজ বিশেষ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ ও প্রচলিত আইনের অপরাধের গভীরতা নির্ণয় ও আইন অনুযায়ী দন্ড বিধান করা।

শাসন বিভাগ (The Executive)

শাসন বিভাগ বলতে কি বোঝায়?

সরকারের শাসন বিভাগ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এজন্য সাধারণ মানুষ শাসন বিভাগকেই সরকার মনে করে থাকে। রাষ্ট্রপতি ➔ প্রধানমন্ত্রী

→ মন্ত্রী পরিষদ → সচিব → অতিঃ সচিব → যুগ্ম সচিব → উপ - সচিব → সিনিয়র সচিব → সহকারী সচিব।

শাসন বিভাগ সর্বোচ্চ পদের অধিকারী প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি। তিনি দেশের রাষ্ট্র-প্রধান। দেশের শাসন কার্য সম্পর্কিত সকল আদেশ তার নামে জারী করা হয়ে থাকে। তিনি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগদান করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে অন্যান্য মন্ত্রীগণের নিয়োগ অনুমোদন করেন। তিনি বাংলাদেশের এ্যাটর্নী জেনারেল, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মচারীগণের নিয়োগদান করেন। তিনি প্রতিরক্ষা বিভাগসমূহের সর্বাধিনায়ক এবং সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধান সাপেক্ষে প্রতিরক্ষা বিভাগসমূহের কমিশন মঞ্জুরী ও বাহিনীর প্রধানগণের নিয়োগদান করেন। তিনি সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিতকরণ এবং মেয়াদ শেষে ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। সংসদে গৃহীত প্রত্যেকটি বিল (Bill) তাঁর অনুমোদন সাপেক্ষে আইনে (Act) পরিণত হয়। তিনি অধ্যাদেশ (Ordinance) জারী করেন যা সংসদে গৃহীত আইনের ন্যায় বলবৎযোগ্য। তবে তা পরবর্তী অধিবেশনে উপস্থাপন করতে হয় অনুমোদনের জন্য। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে মেয়াদ শেষের পূর্বেও সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারেন। সংসদে সরকারী অর্থ ব্যয় বিল উত্থাপন বা অর্থ মঞ্জুরীর দাবীর জন্য তাঁর সুপারিশ প্রয়োজন সাপেক্ষে তিনি বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত সংযুক্ত তহবিল গ্রহণ করার ব্যাপারে ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন।

তিনি সুপ্রীম কোর্ট এর প্রধান বিচারপতিসহ অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগদান করেন। যে কোন আদালত, ট্রাইবুন্যাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দন্ডের মার্জনা, বিলম্ব বা হ্রাস করার ক্ষমতা তাঁর আছে। তবে বিচার করা, শাস্তি প্রদান করা বা বিচারকদের অপসারণ করার ক্ষমতা তাঁর নাই। এ ছাড়া তিনি বিদেশী রাষ্ট্রদূতকে অনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ, প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রী এবং বিচারপতিদের শপথ পাঠ করান।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হচ্ছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। কারণ, রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র নির্বাচন করা ছাড়া সমস্ত কাজই তাঁর (প্রধানমন্ত্রী) পরামর্শ মতে সম্পাদন করেন। যদিও সকল আদেশ রাষ্ট্রপতির নামে জারী করা হয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রী সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের আস্থাভাজন। তিনি রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি মন্ত্রী পরিষদের এবং জাতীয় সংসদের নেতা। প্রয়োজনে তিনি সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার জন্য অথবা কোন মন্ত্রীকে অপসারণের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করতে পারেন।

বাংলাদেশের মন্ত্রী পরিষদ- মন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী নিয়ে গঠিত। তবে তার

কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করা নেই। মন্ত্রীগণ তাদের নিজস্ব বিভাগের কাজসমূহ সম্পাদন করেন এবং অন্যান্যদের সাথে মিলিত হয়ে সবার কাজ পর্যালোচনা করেন। যদিও সমস্ত দায়িত্ব তাদের বহন করতে হয় এবং সংসদে তাদের মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে তারা নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং তিনিই তাদের অপসারণ করতে পারেন। সংসদ সদস্যদের মধ্যে থেকেই মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। তবে মন্ত্রী পরিষদের মোট সদস্যের এক-পঞ্চমাংশ সদস্যকে বাহির হতে নিয়োগ করা যায়।

শাসন বিভাগ দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়- সীমিত অর্থে এবং ব্যাপক অর্থে। সীমিত অর্থে নীতি নির্ধারণকারী শাসন বিভাগীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে শাসন বিভাগ গঠিত হয়। ব্যাপক অর্থে শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তা হতে আরম্ভ করে অফিসের কেরানী এবং পিয়ন পর্যন্ত শাসন বিভাগের অন্তর্ভূক্ত। বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে শাসন বিভাগের নিম্নলিখিত অংশগুলো থাকা প্রয়োজন-

(১) **প্রধান রাজনৈতিক অংশ ঃ** এ অংশে থাকে রাষ্ট্র প্রধান ও মন্ত্রীগণ। তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। তারা নির্বাচিত অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা প্রাপ্ত। তাই নির্বাচনের ফলাফলের ওপর শাসন বিভাগের এ অংশ রাষ্ট্রীয় ও শাসন সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করে।

(২) **প্রশাসনিক কর্মচারীবৃন্দ ঃ** এ অংশকে স্থায়ী কর্মচারী বা সিভিল সার্ভিস বলা হয়। একে আমলাতন্ত্রও বলা হয়। তারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এবং পদোন্নতির দ্বারা স্থায়ীভাবে চাকুরিতে বহাল হন। নির্বাচনের ফলাফলের সাথে এদের কোন পরিবর্তন ঘটে না। তারা বিশ্বস্ত ও অধীনস্থ কর্মচারী। তারা রুটিন অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করে এবং শাসন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে।

(৩) **সামরিক বাহিনী ঃ** দেশ রক্ষার কাজে নিয়োজিত। শাসন বিভাগের অধীন থেকে দায়িত্ব পালন করে। কোন কোন দেশে সামরিক বাহিনী সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ক্ষমতা দখল করে এবং প্রকৃত শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তায় পরিণত হয়।

(৪) **পুলিশ বাহিনী ঃ** আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী স্থায়ী কর্মচারী ও অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত।

শাসন বিভাগের কাজ (Functions Of Executive) : সব দেশে ও সব ধরণের সরকারে শাসন বিভাগের কাজ এক রকম নয়। গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থাতেও রাষ্ট্রপতি ধরণের সরকারে শাসন বিভাগ বেশি মর্যাদা সম্পন্ন।

অপরপক্ষে, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে শাসন বিভাগ কেবলমাত্র শাসন কার্যে নিয়োজিত থাকে না, আইন প্রণয়নেও ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। বিভিন্ন সরকারের ও বিভিন্ন দেশের শাসন বিভাগের কার্যাবলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় শাসন বিভাগ নিম্নে উল্লেখিত কার্যাবলি সম্পাদন করে-

(১) **শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি ঃ** শাসন বিভাগের শাসন সংক্রান্ত কাজ অত্যন্ত ব্যাপক। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো এর কাজের অন্তর্ভূক্ত (ক) প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণ ও প্রশাসন পরিচালনা (খ) আইন বলবৎকরণ (গ) নিয়োগ ও অপসারণ (ঘ) সামরিক ক্ষমতা (ঙ) বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ও বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষা (চ) জরুরি বিধি-বিধান জারি ও জরুরি অবস্থা ঘোষণা।

(২) **আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ ঃ** শাসন বিভাগ আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে। আইন পরিষদে বাণী প্রেরণ, আইন পরিষদ আহবান, বিশেষ অধিবেশন আহবান, বিলে সম্মতি অথবা, ভেটো দান, অর্ডিন্যান্স জারি, আইন পরিষদকে অনুপ্রাণিতকরণ, বিল প্রস্তুতকরণ ও আইন পরিষদে বিল উত্থাপন প্রভৃতি শাসন বিভাগের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ।

(৩) **অর্থনৈতিক কাজ ঃ** শাসন বিভাগ বহুবিধ অর্থনৈতিক কার্যাদি সম্পাদন করে। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখার জন্য শাসন বিভাগ মুদ্রা প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করে। জনকল্যাণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ, জনসংস্থা পরিচালনা, কৃষি উন্নয়ন, সমবায় আন্দোলন পরিচালনা প্রভৃতি কাজ শাসন বিভাগই করে থাকে। শাসন বিভাগ বাজেট প্রণয়ন করে আয়-ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করে। তাছাড়া ভূমি সংস্কার রাজস্ব আদায় ও কর সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ শাসন বিভাগই সম্পন্ন করে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক যাবতীয় কাজ শাসন বিভাগের দায়িত্বে ন্যস্ত।

(৪) **প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কাজ ঃ** দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা শাসন বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শাসন বিভাগের প্রধান সাধারণত সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। শাসন বিভাগের প্রধান সৈন্যবাহিনীর জেনারেলদের নিয়োগ দান করেন ও অপসারণ করতে পারেন। শাসন বিভাগের প্রধানগণ সৈন্যবাহিনীর র‌্যাংক ও মর্যাদা দান করেন এবং পদোন্নতির ব্যবস্থা করেন। শাসন বিভাগের প্রধানগণ যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন। যুদ্ধাবস্থায় বিভাগের কাজ অনেক গুণ বেড়ে যায়। যুদ্ধাবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ঠিক রাখা শাসন বিভাগের কাজ।

(৫) **বিচার সংক্রান্ত কাজ ঃ** শাসন বিভাগ বিচার সংক্রান্ত কিছু কিছু কাজ সম্পাদন করে। শাসন বিভাগ বিচারপতিদের নিয়োগ দান করে। শাসন বিভাগ সাধারণ

ক্ষমা ঘোষণা করে থাকে। দন্ড মাফ ও দন্ড হ্রাস করার অধিকার শাসন বিভাগের হাতে ন্যস্ত।

(৬) **কূটনৈতিক কার্য ঃ** বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ণয় ও পররাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করাও শাসন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সদ্ভাব রজায় রাখা, তাদের স্বার্থরক্ষা ও স্বীয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কাজের জন্য বিদেশে রাষ্টদূত নিয়োগ, অন্যদেশের অনুরূপ রাষ্ট্রদূতদের বরণ, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি প্রেরণ, বিদেশের সাথে চুক্তি ও সন্ধি স্থাপন, পূর্বের চুক্তি রাষ্ট্রের পরিপন্থী হলে তা বাতিল করা- এক কথায় পররাষ্ট্র বিষয়ক কার্যবলী সম্পাদন।

(৭) **অন্যান্য কাজ ঃ** শাসন বিভাগের কর্মকর্তাগণ অনেক সময় কতগুলো কাজ করে যা কোন তালিকাভূক্ত দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত নয়। তারা জাতীয় অনুষ্ঠানে এবং অনেক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। আন্তর্জাতিক অন্যান্য রাষ্ট্রের সুখে ও দুঃখে শুভেচ্ছা ও শোক বাণী প্রেরণ করেন। তাই শাসন বিভাগের কাজের কোন পরিসীমা অঙ্কণ করা যায় না।

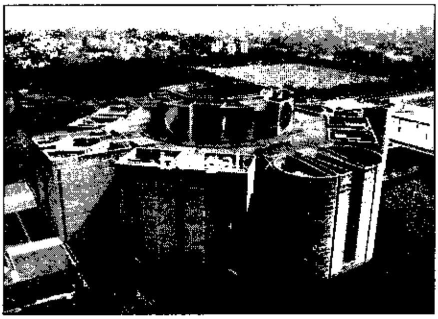

আইন বিভাগ (The Legislature) ঃ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইন বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা এ বিভাগ প্রকৃতপক্ষে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। সরকারের যে বিভাগ রাষ্ট্রের শাসন কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও প্রচলিত আইনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে।

বাংলাদেশের আইন পরিষদ "জাতীয় সংসদ" নামে পরিচিত। বাংলাদেশের জনগণ কর্তৃক সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত ৩০০ জন সদস্য এবং জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনে সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত ৫০ জন মহিলা সদস্যসহ মোট ৩৫০ জনের সমন্বয়ে এই পরিষদ গঠিত।

বিশেষ কারণবশত ঃ রাষ্ট্রপতি যদি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মোতাবেক সংসদ ভেঙ্গে না দেন, তবে এর মেয়াদ হবে প্রথম অধিবেশন হতে ৫ বছর। সংসদের প্রতি দুই অধিবেশনের মধ্যে কখনোই ৬০ দিনের বেশী বিরতি থাকবে না। যদি দেশ যুদ্ধে লিপ্ত থাকে তবে মেয়াদ আইন দ্বারা অনধিক এক বছর বৃদ্ধি করা যাবে। তবে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে বর্ধিত মেয়াদ কোনক্রমেই ৬ মাসের বেশি হবে না। সংসদ ভেঙ্গে

দেওয়ার পর নতুন নির্বাচনের আগে বিশেষ প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি ভেঙ্গে দেয়া সংসদের অধিবেশন আহবান করতে পারেন।

সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা/অযোগ্যতা ঃ

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ জাতীয় সংসদের সদস্য হওয়ার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন না।

(১) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হলে।

(২) দেউলিয়া ঘোষিত হয়ে দায়মুক্ত না হলে।

(৩) অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে বা আনুগত্য প্রদর্শন করলে অথবা অন্য কোন কারণে দেশের নাগরিকত্ব হারালে।

(৪) নৈতিক শৃঙ্খলাজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী হয়ে অনূন্য ২ বছর কারাদন্ডে দন্ডিত হলে এবং মুক্তি লাভের পর ৫ বছর অতিবাহিত না হলে।

(৫) আইন দ্বারা অযোগ্য ঘোষিত হচ্ছে না এমন ব্যতিত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকলে।

(৬) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগ সাজসকারী আদেশের অধীনে কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত হয়ে থাকলে।

(৭) তিনি কোন আইনের দ্বারা বা অধীনে অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য ঘোষিত হলে।

(৮) বয়স ২৫ বছরের নীচে হলে।

উপরোক্ত দোষে দোষী ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য সকলেই সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন।

নিম্নলিখিত কারণসমূহ একজন সংসদ সদস্যের সদস্য পদের অবসান ঘটে -

(১) সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে ৯০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত শপথ গ্রহণ, ঘোষণা করতে বা শপথপত্র বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করতে অসমর্থ্য হলে। তবে স্পীকার যথার্থ কারণে উক্ত সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারেন।

(২) সংসদের অনুমতি ব্যতিত একাধিক্রমে ৯০ বৈঠক দিবস বা কার্যদিবস সংসদে অনুপস্থিত থাকলে।

(৩) সংসদ ভেঙ্গে গেলে।

(৪) অপ্রকৃতিস্থ, দেউলিয়া, বিদেশী প্রমাণিত হলে বা অন্য কোন কারণে অযোগ্য ঘোষিত হলে।

(৫) নির্দিষ্ট দলের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে সে দল হতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে সংসদে কোন ভোট প্রদান করলে।

(৬) স্বেচ্ছায় স্পীকারের কাছে পদত্যাগ পত্র প্রদান করলে।

(৭) একাধিক আসনে নির্বাচিত হয়ে নির্বাচনের ৩০ দিনের মধ্যে তাঁর পছন্দকৃত আসন নির্বাচন করতে না পারলে।

(৮) রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে।

উপরিউক্ত কারণসমূহের যদি কোন পদ শূন্য হয়ে পরে তবে উক্ত পদ শূন্য হওয়ার দিন হতে ৯০ দিনের মধ্যে উপ-নির্বাচন এর মাধ্যমে সেই শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।

সংসদ অধিবেশনসমূহ সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করার জন্য সংসদের ১ম অধিবেশনে সদস্যদের মধ্য হতে একজনকে স্পীকার ও একজনকে ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করা হয়। স্পীকার সংসদের অধিবেশনসমূহে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থ্যতা বা অন্য কোন কারণে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ্য হলে ক্ষেত্র মত নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত কিংবা স্বীয় দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন।

রাষ্ট্রপতি সংসদের ১ম অধিবেশনের সময় ও স্থান নির্ধারণ করেন। তবে সংসদের দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময় কখনই ৬০ দিনের বেশী হবে না এবং যে কোন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যেই সংসদের অধিবেশন ডাকতে হয়। সংসদের অধিবেশন আহবান এবং স্থগিত রাষ্ট্রপতি করতে পারেন। সংসদের যে কোন অধিবেশনে ৬০ সদস্যের উপস্থিতিকে কোরাম হিসাবে গণ্য করা হয়। অন্যথায় ৬০ জন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয় বা অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

আইন বিভাগের কার্যাবলি (Functions of Legislature) : আইন বিভাগ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এটি আজকাল কেবলমাত্র আইন প্রণয়নই করে না। এটি আরও অনেক কাজ করে থাকে। নিন্মে আইন সভার কার্যাবলি আলোচনা করা হলোঃ

(১) **আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ (Law Making Functions) :** আইন সভার মূল কাজ আইন প্রণয়ন করা। এটা জনমতের সাথে সঙ্গতি রেখে আইন প্রণয়ন করে। কারণ আইন জনগণের ইচ্ছার প্রকাশ এবং তাদের ইচ্ছা তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। আইন পরিষদ কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন করে না। প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে আইনের সংস্কার সাধনও করে।

(২) **আলোচনামূলক কাজ (Deliberative funcions) :** কোন আইনই আলোচনা ছাড়া পাস হয় না। আইন পরিষদে বিল উত্থাপিত হলে আইন সদস্যগণ ১ম, ২য়, ও ৩য় পাঠের মাধ্যমে আইনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে আইন প্রণয়নমূলক কাজ ও আলোচনামূলক কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটি একই কাজের দু দিক মাত্র।

(৩) **সংবিধান রচনা ও সংশোধন সংক্রান্ত কাজ (Making and amending of the constituion):** কোন কোন দেশে আইন পরিষদ গণপরিষদ হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদেরকে গণপরিষদের সদস্য ঘোষণা করা হয় এবং তাঁরা গণপরিষদের সদস্য হিসেবে সংবিধান রচনা করেন।

(৪) **প্রশাসনিক কাজ ঃ** আইন সভার পরোক্ষ কিছু প্রশসনিক কাজও রয়েছে। এটি অনেক সময় প্রশাসনিক কাজের তত্ত্বাবধান করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেট- সন্ধি, চুক্তি, যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি স্থাপন এবং উচ্চ পদস্থ কর্মচারী নিয়োগের অনুমোদন দান করে।

(৫) **শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা (Controlling Executive) ঃ** শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা আইন সভার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ ও কাজ দ্বারাই আইন বিভাগ শাসন বিভাগের স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করে এবং প্রশাসনকে জনস্বার্থের অনুকূলে থাকতে বাধ্য করে।

(৬) **বিচার সংক্রান্ত কাজ (Judicial functions) ঃ** আইন সভা বিচার সংক্রান্ত কিছু কিছু কাজ করে থাকে। আইন সভা কোন কোন ক্ষেত্রে সদস্যদের অসদাচরণের বিচার করে থাকে। আইন সভা নির্বাচন সংক্রান্ত বিবাদের নিস্পত্তি করে।

(৭) **অর্থসংক্রান্ত কাজ (Financial Funcions) ঃ** প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আইন সভা কর্তৃক জাতীয় অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ No taxation without represntation এ নীতি হতে আইন পরিষদের অর্থনৈতিক কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। আইন সভার অনুমোদন ছাড়া সরকারি আয় ও ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক আর্থিক বছরের শুরুতে আইন সভার অনুমোদনের জন্য আইন সভায় বাজেট পেশ করা হয়। আইন সভার সদস্যগণ খাতওয়ারী বরাদ্দ বাড়ানোর বা কমানোর সুপরিশ করতে পারেন।

(৮) **নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ (Electoral Funcions) ঃ** আইন পরিষদ নির্বাচনী সংস্থা হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ও ভারতীয় পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্যগণ রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করে থাকে। আমেরিকার কংগ্রেসও নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ করে থাকে।

(৯) **জনমত গঠন সংক্রান্ত কাজ (Moulding Public Openion) ঃ** আইন সভা জনমত গঠনের বাহন হিসেবে কাজ করে। তারা পার্লামেন্টে যে বক্তৃতা বা বিবৃতি দেন তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। অনেক সময় পার্লামেন্টের বিজ্ঞ সদস্যদের সমালোচনা শুনে জনগণ সরকারি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে।

(১০) **সরকারী তহবিল নিয়ন্ত্রণ (To Manange Govt. Fund) ঃ** সংসদের সম্মতি ছাড়া নতুন কর আরোপ করা যায় না। সরকারকে প্রতিবছর আয়-ব্যয়ের অনুমতি হিসাব সম্বলিত একটি বাজেট সংসদে পেশ করতে হয় এবং সংসদে তা আলোচিত হয়। এছাড়া অন্যান্য বিষয় সম্বলিত ব্যয় মঞ্জুরী দাবীর আকারে সংসদে উপস্থাপিত হয় এবং সংসদ তা নির্ধারণের ব্যাপারে মতামত দেন। তবে রাষ্ট্রপতির অনুমতি ব্যতিত কোন অর্থ বিল বা মঞ্জুরী দাবী সংসদে উপস্থাপন করা যায় না।

আইন সভার সংগঠন (Organisation of The Legllslature) ঃ

আইন সভা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এর প্রকৃতি, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা আধুনিক কালের একটি জটিল সমস্যা বিভিন্ন দেশে আইন সভা বিভিন্নভাবে সংগঠিত হয়। আইন সভার সদস্য সংখ্যা, সদস্যদের যোগ্যতা, কার্যকাল নির্বাচন পদ্ধতি এবং কাঠামোগত দিকগুলো বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম।

আইন সভার আকৃতির প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইনসভা খুব ছোট আকারের হবে না কারণ এতে জাতি যথার্থ প্রতিনিধিত্ব হতে বঞ্চিত হয়। এতে প্রতিনিধিগণের সাথে জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না।
আইন সভার কাঠামোগত দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন ক্ষেত্রে আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট হয়। অনেক দেশে আবার এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বিরাজমান। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা উক্ত কক্ষের সংঠনের ব্যাপারে কোথাও কোথাও সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচিত হয়, কোথাও আবার পরোক্ষ নির্বাচন, কোথাও মনোনয়ন আবার কোথাও উত্তরাধিকার সূত্র পদ্ধতিতেও সংগঠিত হয়। গঠন ও কাঠামোগত দিক হতে আইনসভা দু ধরনের হতে পারে। যথা: (ক) এক-কক্ষ বিশিষ্ট। (খ) দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট।

এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা : যখন আইনসভা- একটি সভা একটি মাত্র পরিষদ বা কক্ষ নিয়ে গঠিত হয়ে তখন তাকে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বলে। এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা সাধারণত সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। যেমন- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ।

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা : আইনসভা যখন দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত হয় তখন একে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বলা হয়।

উচ্চ কক্ষের সংগঠন (Compositon of the upper chamber) ঃ উচ্চ কক্ষ বিভিন্ন পদ্ধতিতে গঠিত হতে পারে, যথা- (ক) উত্তরাধিকার সূত্রে, যেমন- ব্রিটেনের লর্ডসভা, (খ) মানোনীত সদস্যের দ্বারা, যেমন- ব্রিটেনের লর্ডসভা (গ) প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা, যেমন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভা, (ঘ) পরোক্ষ নির্বাচনের দ্বারা, যেমন- ফ্রান্সের উচ্চ কক্ষ।

নিম্নকক্ষের সংগঠন (Composition of the lower chamber) ঃ নিম্নকক্ষ প্রতিনিধিত্বমূলক সভা। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ নির্বাচনে সদস্যদের নিয়ে নিম্নকক্ষ গঠিত হয়।

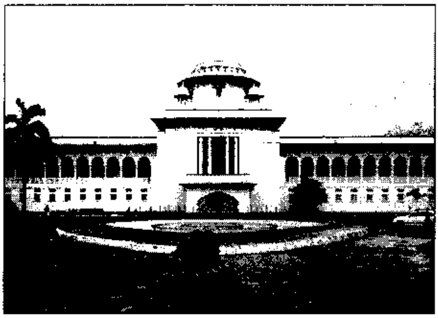

বিচার বিভাগ (Judiciary) আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত, শাসন বিভাগ কর্তৃক কার্যকরীকরণ আইনের ব্যাখ্যা দেয়া, প্রচলিত আইনকে ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ এবং ন্যয়ের সংরক্ষণ করার প্রাথমিক দায়িত্ব যে বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকে তাকেই বিচার বিভাগ বলে। সুপ্রীম কোর্ট, অন্যান্য অধঃস্থন আদালত এবং প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যাল নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত।

সুপ্রীম কোর্ট ঃ বাংলাদেশের শীর্ষ আদালতের নাম "বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট"। এটি দুটি বিভাগ নিয়ে গঠিত। বিভাগ দুটি হল (১) আপীল বিভাগ (২) হাইকোর্ট বিভাগ। কতজন বিচারক নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হবে তা সংবিধানের সুনির্দিষ্ট করা নেই। রাষ্ট্রপতি এর সংখ্যা নির্ধারণ করেন। সুপ্রীম কোর্টের একজন প্রধান বিচারপতি থাকেন, যিনি "বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি" নামে অভিহিত হন। প্রধান বিচারপতি ও আপীল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ আপীল বিভাগে এবং অন্যরা হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সনের অষ্টম সংশোধনী অনুসারে

সুপ্রীম কোর্ট সম্বন্ধে নতুন কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তা হচ্ছে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন রাজধানীতে থাকবে। হাইকোর্ট বিভাগ ও তার বিচারপতিগণ সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন এবং তার বেঞ্চসমূহে বসবেন। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রংপুর, যশোর, সিলেট, বরিশালে একটি করে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ থাকবে এবং একই সাথে এই ৬টি বেঞ্চকে সার্কিট বেঞ্চে রূপান্তরিত করা হবে। তবে বর্তমানে এ ব্যবস্থা রহিত করা হয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। তিনি এবং রাষ্ট্রপতি মিলে অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ প্রদান করেন। প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হলে কিংবা দায়িত্ব পালনে অসমর্থ্য হলে আপীল বিভাগের প্রবীণতম বিচারপতি অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি যদি প্রয়োজন মনে করেন তবে প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে যে কোন বিভাগের বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারেন। এ ছাড়া রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে এক বা একাধিক ব্যক্তি অনধিক দুই বছরের জন্য অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে নিয়োগ পেতে পারেন বা যোগ্যতা সম্পন্ন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক অস্থায়ী মেয়াদের জন্য আপীল বিভাগে আসন গ্রহণ করতে পারেন।

সুপ্রীম কোর্টের দুই বিভাগ (১) আপীল বিভাগ (২) হাইকোর্ট বিভাগ হলেও হাইকোর্ট বিভাগ আপীল বিভাগের অধঃস্থন শাখা। হাইকোর্ট এবং সুপ্রীমকোর্ট কোন পৃথক সংস্থা না হলেও প্রকৃত পক্ষে সুপ্রীম কোর্টের সাধারণ ক্ষমতা আপীল বিভাগে প্রয়োগ করে। সুপ্রীম কোর্টের নীচে জেলা আদালত এবং তার নীচে মুন্সেফ আদালত, ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। সকল অধঃস্থন আদালত, ট্রাইবুন্যালের উপর হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে।

আপীল বিভাগের কোন আদি এখতিয়ার নেই। এটা কেবল হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল শুনে এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে সংবিধানের বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করে হাইকোর্টের আদি ও আপীল উভয় এখতিয়ারই রয়েছে। মৌলিক অধিকার বলবৎ করার ক্ষমতা হাইকোর্টের আদি এখতিয়ারের অন্তর্ভূক্ত। উচ্চ মূল্যজনিত দেওয়ানী মামলার জেলা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে, গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারী মামলার আপীলও হাইকোর্ট শ্রবণ করে। অনুরূপভাবে জেলা ও দায়রা বিচারকগণ দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তি করেন। নিম্নস্তরে মুন্সেফ কোর্ট দেওয়ানী মামলার এবং ফৌজদারী মামলার দায়িত্ব ম্যাজিস্ট্রেটগণের উপর ন্যস্ত থাকে।

বিবাহ-বিচ্ছেদ, দাম্পত্য অধিকার পুনঃরুদ্ধার, মোহরানা, ভরণ-পোষণ, অভিভাবকত্ব এবং শিশুদের তত্ত্বাবধান-এই ৫টি বিষয় থেকে সৃষ্ট সমস্যাবলীকে সমাধানের জন্য

১৯৮৫ সালে জারিকৃত একটি অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী "পারিবারিক আদালত" গঠিত হয়েছে। দেশের সকল মুন্সেফ কোর্টে এই আদালত বসে এবং মুন্সেফগণ এর বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। তবে দেশের পার্বত্য জেলাসমূহের জন্য এই আইন প্রযোজ্য নয়।

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যাল। সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ, বরখাস্ত, দন্ডদান ও কর্মের অন্যান্য শর্তাবলী এবং রাষ্ট্রায়ত্ব উদ্যোগসমূহের ব্যবস্থাপনা, সরকার পরিচালিত কোন সম্পত্তির প্রশাসন ইত্যাদি হতে উদ্ভূত বিষয়াদির উপর এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য "জাতীয় সংসদ" আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল গঠন করতে পারে এবং এর এখতিয়ার অর্ন্তগত কোন বিষয়ে অন্য কোন আদালত কোন প্রকার কার্যধারা গ্রহণ করতে পারে না। এছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির জন্য রয়েছে "লেবার এ্যাপীলেট ট্রাইবুন্যাল"।

সংবিধানে বিধান রয়েছে যে, বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃংখলা বিধানের ভার সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত থাকবে।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারকের যোগ্যতা-

(*) বাংলাদেশের নাগরিক।

(*) সুপ্রীম কোর্টে ১০বছর ওকালতী করতে হবে অথবা

(*) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অনূন্য ১০ বছর কোন বিচার বিভাগীয় পদে দায়িত্ব পালন করতে হবে অথবা

(*) ১০ বছর এ্যাডভোকেট ছিলেন এবং তিন বছর জেলা বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

জেলা বিচারক - কোন ব্যক্তি জেলা বিচারকের পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য হবেন না, যদি তিনি-

(*) নিয়োগ লাভের সময় প্রজাতন্ত্রের কর্মরত না থাকেন এবং কর্মে অনূন্য সাত বছর কাল বিচার বিভাগীয় পদে বহাল না থেকে থাকেন অথবা

(*) অনূন্য ১০ বছর কাল এ্যাডভোকেট না থেকে থাকেন।

একজন ব্যক্তি বিচারক লাভের পর অন্য কোন লাভজনক পদে বহাল হতে পারবেন না এবং মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে গঠিত কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনায় যুক্ত হতে পারবেন না। স্থায়ী বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর অবসর গ্রহণ বা অপসারিত হলে, কোন আদালতে বা কর্তৃপক্ষের সম্মুখে ওকালতি করতে পারবেন না এবং প্রজাতন্ত্রের কোন কর্মে নিয়োগের যোগ্য হবেন না। একজন বিচারক ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে পারবেন যদি না

"সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল" কর্তৃক অসামর্থের জন্য স্বীয় পদে অযোগ্য ঘোষিত না হন। "সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল" কোন বিচারককে অযোগ্য ঘোষণা করলে রাষ্ট্রপতি সরাসরি তাঁকে অপসারণ করতে পারেন। সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বলে প্রধান বিচারপতি ও পরবর্তী দুজন সিনিয়র বিচারপতির সমন্বয়ে "সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল" গঠিত।

বিচার বিভাগের গুরুত্ব (Importance of Judiciary) : বিচার বিভাগ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় শাখা। রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য ব্যক্তির অধিকার রক্ষা। কিন্তু বিচার বিভাগের অনুপস্থিতিতে ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করা সম্ভব নয়। আইন বিভাগের অনুপস্থিতিতে একটা সমাজ কল্পনা করা সম্ভব কিন্তু বিচার বিভাগের অনুপস্থিতিতে একটা সমাজের ধারণা করা সম্ভব নয়।

বিচার বিভাগের কার্যাবলি (Functions of The Judiciary) : বিচার বিভাগ সাধারণত নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করে -

ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সবই নিয়ন্ত্রিত হয় সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক। আবার সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা, কার্যাবলী ও এখতিয়ারকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) আপীল বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলী (২) হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।

(১) আপীল বিভাগের ক্ষমতা, কার্যবলী ও এখতিয়ার ঃ

(ক) আপীল নিষ্পত্তি ঃ এই বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তি করে থাকে। সংবিধানের ব্যাখ্যার প্রশ্ন জড়িত মামলা, হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড প্রদান বা বহাল যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান, হাইকোর্ট বিভাগ তার অবমাননায় কোন দন্ড প্রদান করলে, হাইকোর্ট বিভাগের সার্টিফিকেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে আপীল বিভাগ অনুরূপ মামলা গ্রহণ, শুনানী ও নিষ্পত্তি করে থাকে।

(খ) পরোয়ানা জারী ঃ প্রয়োজন হলে এই বিভাগ কোন ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হওয়ার বা দলিলপত্র দাখিল করার আদেশ প্রদান করতে পারে।

(গ) বিধি প্রণয়ন ঃ সংসদ প্রণীত আইন সাপেক্ষে এই বিভাগ রাষ্ট্রপতির অনুমতিক্রমে প্রত্যেক বিভাগের ও অধঃস্থন আদালতের রীতি ও কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করে।

(ঘ) উপদেশমূলক ঃ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের মতামত চাইলে আপীল বিভাগ বিষয়টি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে মতামত প্রদান করে থাকে।

(২) হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা, কার্যাবলী ও এখতিয়ার ঃ

(ক) মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ঃ সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ হাইকোর্ট বলবৎ করণের দায়িত্ব পালন করে। অধিকার বলবৎকরণের জন্য হাইকোর্ট নিষেধাজ্ঞা, পরমর্শাদেশ, বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ, অধিকার সংক্রান্ত প্রভৃতি ধরণের আদেশ বা নির্দেশ দিয়ে থাকে। এই বিভাগ কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে অন্য যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের প্রতি উপযুক্ত আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করে থাকে।

(খ) তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ঃ হাইকোর্ট বিভাগ তার অধীনস্থ সকল আদালতের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

(গ) অধঃস্থন আদালতের মামলা স্বহস্থে গ্রহণ ঃ অধঃস্থন আদালতের কোন মামলার সাথে সংবিধানের ব্যাখ্যা জড়িত বা অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ক যে কোন মামলা অধঃস্থন আদালতের হতে প্রত্যাহার করে স্বহস্থে গ্রহণ বা অন্যভাবে মীমাংসার ব্যবস্থা গ্রহণ করে হবে।

(ঘ) আপীল নিষ্পত্তি ঃ অধঃস্থন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল শুনানীর মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি করে থাকে।

সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল

বাংলাদেশের সংবিধান অর্থাৎ ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধান সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ পদ্ধতি ও অপসারণ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদ এর হাতে যৌথভাবে ন্যস্ত ছিল। অসদাচরণ ও অসামর্থের কারণে কোন বিচারপতিকে অপসারণের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্ত দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন প্রাপ্ত হয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করলে রাষ্ট্রপতি সেই বিচারককে অপসারণ আদেশ জারী করার মাধ্যমে তাঁকে পদচ্যুত করতে পারতেন। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ২৫ শে জানুয়ারী গৃহীত চতুর্থ সংশোধনী বলে রাষ্ট্রপতি সরাসরি বিচারপতিগণের অপসারণ ক্ষমতা লাভ করেন। ফলে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণও সাধারণ কর্মচারীর পর্যায়ভূক্ত হয়ে যান। এতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রচন্ডভাবে খর্ব হয়। ১৯৭৭ সালের ২৩শে এপ্রিল রাষ্ট্রপতির এক আদেশ বলে উক্ত ব্যবস্থার অবসান হয় ও সংবিধানের ৫ম সংশোধনী অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও তাঁর পরবর্তী দুজন সিনিয়র বিচারপতিকে নিয়ে একটি "সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল" গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই কাউন্সিলের দায়িত্ব হচ্ছে-

(ক) সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করা।

(খ) বিচারপতিদের অসদাচরণ ও অপসারণ সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও এ বিষয়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

রাষ্ট্রপতি উক্ত কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে কোন বিচারকের অসদারচরণ ও অসমার্থ্যের কারণে স্বীয় পদে অযোগ্যতার অভিযোগ অনুযায়ী সেই বিচারকের অপসারণ আদেশ জারী করতে পারেন।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে রোভার স্কাউটরা বাংলাদেশের সংবিধান সহ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের গঠন, কার্যাবলী এবং এখতিয়ার সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে। এই বিষয়ে সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন বই সহ অভিজ্ঞজনের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য দেশের সরকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা অতি আবশ্যক। যাতে প্রয়োজনীয় সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসুবিধা না ঘটে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (Independence Of Judiciary) : একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বাধীন বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। গণতান্ত্রিক অধিকার ও মূল্যবোধগুলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অনুপস্থিতিতে মূল্যহীন। কারণ স্বাধীন বিচার বিভাগের অনুপস্থিতিতে সরকারের স্বৈরাচারিত্ব ও সীমা লঙ্ঘন বন্ধের কোন ব্যবস্থা থাকে না। অপরপক্ষে, ব্যক্তির অপরাধ ও হঠকারিতা হতেও দুর্বলকে রক্ষা করা দরকার। সরকারি বিভাগগুলোর মধ্যেও ভারসাম্য রক্ষা করা দরকার। তাই ব্যক্তির অধিকার রক্ষা, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা ও সর্বোপরি সংবিধানের প্রধানের প্রাধান্য রক্ষার জন্য স্বাধীন বিচার বিভাগ অপরিহার্য। তাই বলা হয় সরকারের উৎকৃষ্টতা যাচাইয়ের সর্বোৎকৃষ্ট মানদন্ড হল বিচার বিভাগের দক্ষতা ও স্বাধীনতা।

০২. বাংলাদেশে জাতিসংঘ এবং এর শাখাসমূহের কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন (যেকোন ০২টি শাখা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানার্জন)।

জাতিসংঘ

১৯৪৫ সালে ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ বা United Nations জন্মলাভ করে।

বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য ১৯৩টি দেশ (১৪/৭/১১)। জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল (মহাসচিব) দের নাম, দেশের নাম ও কার্যকাল দেওয়া হল-

ক্রম ও নাম	দেশ	কার্যকাল
(১) ট্রিগাভেলী	নরওয়ে	১৯৪৬-১৯৫৩
(২) দ্যাগ হেমারশোল্ড	সুইডেন	১৯৫৩-১৯৬১
(৩) উথান্ট	বার্মা (মায়ানমার)	১৯৬১-১৯৭১
(৪) কুর্ট ওয়াল্ডহেইম	অষ্ট্রিয়া	১৯৭২-১৯৮১

(৫) জ্যাভিয়ার পেরেজ দ্য কুয়েলার	পেরু	১৯৮২-১৯৯১
(৬) ডঃ বুট্রোস ঘালী	মিশর	১৯৯২-১৯৯৬
(৭) কফি আনান	ঘানা	১৯৯৭-২০০৬
(৮) বান কি মুন	দঃ কোরিয়া	২০০৭-

জাতিসংঘের অংগ সংগঠনসমূহের কার্যাবলীঃ জাতিসংঘের মূল ছয়টি সংস্থা ছাড়াও কতকগুলি অংগ সংগঠন রয়েছে। নিচে এগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

ইউনেসকো (UNESCO) ঃ এটি জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান সাংস্কৃতিক সংস্থা বা United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ১৯৪৬ সালে ০৪ নভেম্বর এ সংস্থা গঠিত হয়। এ সংস্থা একটি কার্যকরী পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হয়। মহাপরিচালকসহ এ সংস্থার একটি সচিবালয় আছে। প্যারিসে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। বিশ্বের সমস্ত জাতির মধ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এ সংস্থার লক্ষ্য। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের দ্বারে শিক্ষার আলো পৌঁছানোই এ সংস্থার অন্যতম কাজ।

ইউনিসেফ (UNICEF) ঃ United Nations International Children's Emergency Fund বা জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শিশু জরুরি তহবিল। ইউনিসেফের কাজ হল আন্তর্জাতিকভাবে শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ করা। শিশুদের মান উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো। ১৫৭টি রাষ্ট্র বা টেরিটরিতে এ সংস্থার কার্যক্রম বিদ্যমান। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলির (বিশেষ করে) শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, জরুরী ত্রাণ, নিরাপত্তা, পানি এবং স্যানিটেশন নিশ্চিত করা এ সংস্থার কাজ। যে কোন জরুরী কর্মকান্ড পরিচালিত করা আন্তর্জাতিকভাবে জাতিসংঘ শিশু তহবিলের অন্যতম প্রধান কাজ। ১৯৪৬ সালে এটি গঠিত হয়। তবে ১৯৫৩ সালে স্থায়ী অংগ সংস্থা হিসেবে কাজ করে UNICEF। এর সদর দপ্তর নিউইয়র্কে।

বিশ স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ঃ World Health Organization ১৯৪৬ সালের ০৭ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলন, একটি কার্যকরী পরিষদ ও একটি

সম্পাদকীয় দপ্তর নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কাজ করে থাকে। এ সংস্থার সাধারণ সম্মেলন প্রতি বছর এক বার অনুষ্ঠিত হয়। জেনেভায় এ সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত। "শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য বিশ্বের সকল মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা অপরিহার্য"- এ মহা সত্যকে সামনে নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কার্যরত। এ সংস্থা বিশ্বের বিভিন্ন জাতির সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এবং সমগ্র বিশ্বকে রোগমুক্ত করার মানসে বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনুরোধক্রমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যক্রমকে বাস্তবায়নের জন্য এ সংস্থা বিভিন্নভাবে ঐসব দেশের সরকারকে সাহায্য করে থাকে। কলেরা, যক্ষ্মা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, যৌনব্যাধি ইত্যাদি রোগের উচ্ছেদ সাধনের জন্য প্রচেষ্টা চালায়। দুরারোগ্য ব্যাধি নির্মূল করাই এ সংস্থার অন্যতম লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে এ সংস্থা গবেষণাসহ ব্যাপক প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম চালু করেছে।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ঃ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বা Food and Agricultural Organization ১৯৪৫ সালে ১৬ আক্টোবর স্থাপিত হয়। একটি কার্যকরী পরিষদ ও এক জন মহাপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মচারী নিয়ে একটি সচিবালয়ে সংস্থার কার্যক্রম কার্যরত। প্রতি দু'বছর অন্তর সংস্থা সাধারণ সম্মেলনের ব্যবস্থা করে। এ সংস্থার সদর দফতর ইটালীর রোমে অবস্থিত। বিশ্বের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও পুষ্টি সংরক্ষণের মহাব্রত নিয়ে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা জন্মলাভ করেছিল। বর্তমানে এ সংস্থার অন্যতম লক্ষ্য হলো "বিশ্বকে ক্ষুধামুক্ত করা।"

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ঃ International Labor Organization বা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা প্রথমে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অংগ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থাপিত হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়। জেনেভায় ILO এর সদর দফতর অবস্থিত।

এ সংস্থার প্রধান কাজ- শ্রম অবস্থায় উন্নতি সাধন; জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা; শ্রমিক, পরিচালক ও সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব সাধন

করা। উন্নয়নশীল দেশগুলোর পারস্পরিক কারিগরি সহযোগিতা লাভে সাহায্য করাও এর অন্যতম কাজ।

এছাড়াও জাতিসংঘের আরো অনেকগুলি অংগ সংগঠন রয়েছে। যেগুলি তাদের নিজস্ব কর্মসূচী অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত। উল্লেখযোগ্য সংস্থাগুলো হলো-

- ☑ IMF -International Monetary Fund (আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল)
- ☑ IAEA -International Atomic Energy Agency (আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সি)
- ☑ ICAO -International Civil Aviation Organization (আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা)
- ☑ IBRD -International Bank for Reconstruction and Development (World Bank) (আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক বা বিশ্বব্যাংক)
- ☑ WMO -World Meteorological Organization (বিশ্ব আবহাওয়া বিষয়ক সংস্থা)
- ☑ IMCO -Inter Govermental Maritime Consultative Organization
- ☑ GATT -General Agreement on Tariffs and Trade
- ☑ UNDP -United Nations Development Program (আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কার্যক্রম)
- ☑ UNFPA -United Nations Fund for Population Activities (জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল)
- ☑ IDA -International Development Agency (আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা)
- ☑ UPU -Universal Postal Union (বিশ্ব ডাক সংস্থা)
- ☑ ITU -International Telecommunication Union (আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন)

জাতিসংঘ বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। সেই লক্ষ্যে প্রায় সত্তর বছর ধরে এই সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিকভাবে জাতিসংঘের গ্রহণযোগ্যতা অপরিহার্য। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬ তম সদস্য রাষ্ট্র। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অস্তিত্ব রক্ষার্থে জাতিসংঘের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিস্তারিত জানতে- www.un.org

০৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

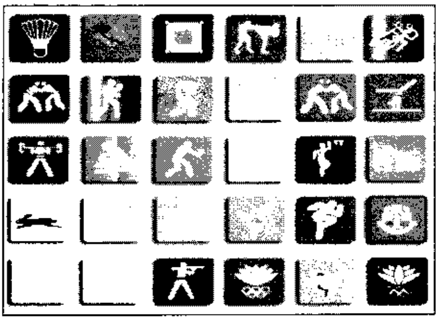

গঠন ও কার্যবন্টন ঃ ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশেষ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি হয়। এর পর ১৯৮২ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়কে বিলুপ্ত করে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে যুব উন্নয়ন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে যুব সমাজ ও ক্রীড়া ক্ষেত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৮৪ সালে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া অংশ এবং শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের যুব উন্নয়ন বিভাগকে একীভূত করে 'যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়' নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

Rules of Business এর Schedule-1 (Allocation of Business among the different Ministries and Division) অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপর নিম্নবর্ণিত কার্যাদি অর্পিত হয়েছে ঃ

০১. যুবদের কল্যাণ, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ক সকল কার্যাদি;
০২. উন্নয়নমূলক কাজে যুবদের স্বেচ্ছা অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা;
০৩. যুবদের কল্যাণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা;
০৪. নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য অর্থ মঞ্জুরী;
০৫. যুব পুরস্কার প্রদান;
০৬. যুবদের দায়িত্বশীল, আত্মবিশ্বাসী এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলি অর্জনে উৎসাহ প্রদানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ;
০৭. 'যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর গবেষণা ও জরিপ;
০৮. বেকার যুবদের জন্য কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;
০৯. বিভিন্ন প্রকার খেলাধূলা ও ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ;
১০. জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান;
১১. ক্রীড়ার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ হতে অনুদানের ব্যবস্থাকরণ;
১২. বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাকে অনুদান প্রদান;
১৩. ক্রীড়াক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ;
১৪. ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদানের জন্য মেধা পুরস্কার প্রদান;

১৫. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলাধূলায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ;
১৬. ক্রীড়া বিষয়ক প্রকাশনার উন্নয়ন;
১৭. ক্রীড়া বিষয়ক জাতীয় সংস্থাসমূহ;
১৮. অন্য দেশের সাথে ক্রীড়া দল বিনিময়;
১৯. ক্রীড়াবিদদের পেনশন প্রদান;
২০. আর্থিক বিষয়সহ সচিবালয় প্রশাসন;
২১. মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ;
২২. বিভিন্ন দেশ এবং বিশ্ব সংস্থার সংগে অত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন ও যোগাযোগ রক্ষা;
২৩. অত্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কিত সকল আইন;
২৪. অত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল পরিসংখ্যান ও অনুসন্ধান;
২৫. আদালতের আদায়যোগ্য অর্থ ব্যতীত অত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ের ফি ।

সাংগঠনিক কাঠামো ঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দায়িত্বে রয়েছে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী । সচিব প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে মন্ত্রণালয়সহ অধঃস্থন অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/ সংস্থাসমূহের কার্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য আইন/ বিধি/ নির্দেশ অনুযায়ী নিষ্পন্নের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত । তাছাড়া প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টিং অফিসার হিসাবে মন্ত্রণালয়/ সংযুক্ত দপ্তর/ অধঃস্থন সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব সচিব এর উপর ন্যস্ত রয়েছে ।

এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বাদি সম্পন্নের জন্য রয়েছে চারটি অধিশাখা । যথা ঃ (১) প্রশাসন, (২) যুব, (৩) ক্রীড়া ও (৪) পরিকল্পনা । প্রশাসন অধিশাখা দুটি শাখায়- প্রশাসন-১, প্রশাসন-২, যুব অধিশাখা দুটি শাখায়- যুব-১, যুব-২; ক্রীড়া অধিশাখা তিনটি শাখায়- ক্রীড়া-১ ক্রীড়া-২, ক্রীড়া-৩ এবং পরিকল্পনা অধিশাখা চারটি শাখায়- পরিকল্পনা-১, পরিকল্পনা-২, পরিকল্পনা-৩ ও পরিকল্পনা-৪ এ বিভক্ত হয়ে কার্যাদি সম্পন্ন করে ।

একজন যুগ্ম সচিব অধিশাখাসমূহের কাজের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করে থাকেন । প্রতিটি অধিশাখার দায়িত্বে একজন উপ-সচিব/উপ-প্রধান (পরিকল্পনা) রয়েছে ।

যুব কল্যাণ তহবিল

নির্বাচিত যুব সংগঠনগুলোকে প্রকল্প ভিত্তিক অনুদান প্রদান এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য যুবদের পুরস্কৃত করার উদ্দেশ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১৯৮৫ সালে অধ্যাদেশ নং- SL এর মাধ্যমে যুব কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয় ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : যুবদের অনুদান ও পুরস্কৃত করা সহ যুব সংগঠনসমূহকে প্রকল্প ভিত্তিক অনুদান প্রদানপূর্বক যুব সংগঠনের মাধ্যমে যুব সমাজকে আত্মকর্মী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উৎসাহী ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা এ তহবিলের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

তহবিল পরিচালনা পদ্ধতি : এ তহবিল পরিচালনার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ড ও ১২ (বার) সদস্য বিশিষ্ট সিলেকশন কমিটি রয়েছে। তহবিল পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালনা বোর্ডই চূড়ান্ত ক্ষমতাবান।

জাতীয় যুব দিবস : দেশের যুব সমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে তাদেরকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর ১লা নভেম্বর জাতীয় যুব দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। যে সকল প্রশিক্ষিত সফল যুবক ও যুব মহিলা আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প স্থাপনে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হন, তাদেরকে জাতীয় যুব দিবসে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রতিবছর ১৬ জন সফল যুব ও যুব মহিলাকে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়।

যুব সংগঠন তালিকাকরণ ও অনুদান : যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের প্রধান দায়িত্ব যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের। যুব উন্নয়ন সংগঠনসমূহকে দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক এদের তালিকাভুক্তির কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। এ যাবত (২০০৮) ৬,৮৩৮ টি যুব সংগঠন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক তালিকাভুক্ত হয়েছে।

যুব কর্মসংস্থানে খাস ও বদ্ধ জলাশয় ইজারা প্রদান : যুব কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০ একর পর্যন্ত খাস ও বদ্ধ জলাশয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তালিকাভূক্ত যুব সমবায় সমিতিকে ইজারা দেয়ার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দেয়। সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী এসব জলাশয় জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে যুব সমবায় সমিতিকে ইজারা দেওয়া হচ্ছে।

ক্রীড়াজগত : দেশের খেলাধূলার প্রসার ও মানোন্নয়ন এবং যুব সমাজকে ক্রীড়ামুখী করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭৭ সালের ২০ জুলাই থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে এবং জাতীয় ক্রীড়া আর্কাইভে পরিণত হয়েছে। এ দেশের ক্রীড়াঙ্গনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, নানা তথ্য, ছবি পরিসংখ্যান সহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঠাঁই করে নিয়েছে 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পাতায় পাতায়।

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) : আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে দেশকে সারা বিশ্বে একটি সম্মানের আসনে বসাবে এ প্রত্যাশা পূরণের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ সালে 'বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অফ স্পোর্টস' একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে সরকারের একটি বিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' নামে এর পুনঃ নামকরণ করা হয়। ১৯৮৬ সালের ১০ এপ্রিল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে দেশকে প্রতিষ্ঠা দেবার নিরলস প্রচেষ্টায় নিবেদিত রয়েছে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

অবস্থান- সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধ এবং ঢাকা ইপিজেড এর উত্তর দিকে নবীনগর-কালিয়াকৈর সংযোগ সড়ক ধরে ০৯ কিলোমিটার দূরত্বে সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে জিরানীতে ১১৫ একর জমির উপর মনোরম পরিবেশে বিকেএসপি-র অবস্থান। রাজধানী ঢাকার জিরো পয়েন্ট হতে সড়ক পথে এর দূরত্ব প্রায় ৪৫ কিলোমিটার।

ভর্তি- বিকেএসপি-তে ক্রীড়াশৈলী অর্জনের সাথে সাথে ৭ম শ্রেণী হতে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত মানবিক ও বিজ্ঞান বিষয়ে সাধারণ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। এটি একটি সম্পূর্ণ আবাসিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০০০ শিক্ষা বৎসর হতে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিকেএসপি'র ১০টি ক্রীড়া বিভাগে প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। শুধুমাত্র টেনিস, জিমন্যাষ্টিক্স, বক্সিং এবং সাঁতারে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হয়। এ সকল খেলায় টপ পারফরমেন্স লেভেল অল্প বয়সে হয়, তাই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এছাড়া অন্যান্য ৬টি বিভাগে (ফুটবল, হকি, শ্যুটিং, ক্রিকেট, বাস্কেট বল, এ্যাথলেটিক্স) ৭ম শ্রেণী হতে ভর্তি শুরু হয়।

০৪. বাংলাদেশে কাজ করে এমন অন্ততঃ ০১টি আন্তর্জাতিক যুব সংস্থার কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

যুব সংগঠন : বাংলাদেশের অর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখে যায় যে, অবক্ষয়ের নীল থাবা যুব সমাজকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে সবচেয়ে বেশী।

আত্মবিশ্বাসহীন হতাশায় প্রাণপ্রিয় স্বদেশের ভবিষ্যত এই যুব সমাজ বিভিন্ন অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ সমাজকে এই অবস্থা থেকে ফিরিয়ে দেশ গঠনে অবদান রাখার সুযোগ তৈরী করে দেয়ার লক্ষ্যে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন যুব সংগঠন। নিম্নে এদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

যুব রেড ক্রিসেন্ট ঃ যুবকদের স্বাস্থ্য ও জীবনের নিরাপত্তা বিধান, সেবা এবং সম্প্রীতি, আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব ও শান্তির জন্য শিক্ষা, মানবতার সম্প্রসারণ এবং নীতিমালার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্ত মানবতার সেবায় নিয়োগ করানোর লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির অংগ সংগঠন হিসেবে যুব রেড ক্রস এর যাত্রা। যা বর্তমানে 'যুব রেড ক্রিসেন্ট' নামে পরিচিত।

যুব রেড ক্রিসেন্টের কার্যক্রম তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত ঃ

(ক) **বিদ্যালয়/ মহাবিদ্যালয় পর্যায়ে ঃ** প্রশিক্ষণ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, বুক ব্যাংক, পুরাতন কাপড় সংগ্রহ, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালনা, বাগান তৈরী, এ্যালবাম প্রস্তুত ও বিনিময়, দেয়াল পত্রিকা তৈরী ও অন্যান্য আরো কিছু কার্যক্রম।

(খ) **ইউনিট পর্যায়ে ঃ** নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ, সেবামূলক কার্যক্রম, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালনা, হাসপাতাল পরিদর্শন, ত্রাণ কার্য, বিনিময় সফর, এ্যালবাম, শুভেচ্ছা কার্ড বিনিময়, যুব রেড ক্রিসেন্ট ক্যাম্প, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস উদযাপন, তহবিল সংগ্রহ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, মিনি প্রোজেক্ট, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, শান্তি মিছিল (রেড ক্রিসেন্ট আদর্শ মূলনীতি প্রচার) বিদ্যালয়/ মহাবিদ্যালয়/ মুক্তদলের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ইত্যাদি।

(গ) **জাতীয় পর্যায়ে ঃ** জাতীয় যুব রেড ক্রিসেন্ট ক্যাম্প, ত্রাণকার্য, হাসপাতাল পরিদর্শন, আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব বিনিময় সফর, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালনা, সেবামূলক কার্যক্রম, তহবিল সংগ্রহ, প্রকল্প ইউনিটসমূহের যুব রেড ক্রিসেন্ট এর সাথে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি। রেডক্রস/ রেডক্রিসেন্ট এর আদর্শকে সামনে রেখে গৃহীত যে কোন ধরণের কার্যক্রম এ সংগঠন

উৎসাহিত করে। উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে যুব রেড ক্রিসেন্ট জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে। প্রতিবছর জাতীয় পর্যায়ে আয়োজন করা হয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। এ ছাড়া জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেমনঃ রফতানী মেলা, শিল্প মেলা, শিশু মেলা, জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশ ইত্যাদিতে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালনা করে থাকে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

লিও ক্লাব ঃ এটি একটি আন্তর্জাতিক যুব সংগঠন। সমাজে যুব শ্রেণীর মধ্যে সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটিয়ে বিশ্বের যুবক-যুবতীগণকে নিজ দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার লক্ষ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজের দায়িত্বপূর্ণ সভ্য হিসেবে উচ্চমানের ন্যায় নীতি, সমাজ সেবার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন, আন্তর্জাতিক মনোভাব বৃদ্ধিতে সহায়তার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক লায়ন্স পরিবারের যুব সংগঠন রূপে লিও ক্লাবের কার্যক্রম শুরু হয়। সাধারণত: মহাবিদ্যালয়/ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ ছাত্রীদের দ্বারা লিও ক্লাব সংগঠিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক লিও ক্লাবের অভিভাবক হিসেবে একটি লায়ন্স ক্লাব দায়িত্ব পালন করে এবং উক্ত ক্লাবের কমপক্ষে একজন লায়ন লিও ক্লাবের মিটিং এ উপস্থিত থাকেন।

এই সংগঠনের সদস্যগণ নিম্ন কার্যাবলীর মাধ্যমে আত্ম উন্নয়ন তথা জাতি গঠনে সহায়তা প্রদান করে থাকে। রক্তদান কর্মসূচী, অন্ধত্ব প্রতিরোধ কার্যক্রম, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও ঔষধ বিতরণ, বৃক্ষরোপন, বস্ত্রদান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক সম্মেলন, জাতীয় যুব ক্যাম্প মাহফিল, লিফলেট বিতরণ, ত্রাণ তৎপরতা ইত্যাদি।

রোটারাক্ট ক্লাবঃ আন্তর্জাতিক যুব সংগঠন হচ্ছে রোটারাক্ট ক্লাব। ব্যক্তিত্ব বিকাশে যুবক-যুবতিদের বাস্তব ও সামাজিক চাহিদার প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং বন্ধুত্ব ও সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে উন্নত সম্পর্ক গড়ে তোলায় রোটারাক্ট আন্দোলন শুরু হয়।

১৯০৫ সালে পল পার্সিভ্যাল হ্যারিস যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে রোটারীর সূচনা করেন। বয়সভেদে চারটি পর্যায়ে এই

আন্দোলনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ৬-১১ বছর বয়সীরা হলো Early Act এবং তারা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে Early Act ক্লাবের মাধ্যমে। ১২-১৮ বছর বয়সীরা Interactor তারা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে Interact ক্লাবের মাধ্যমে। ১৮-৩০ বছর বয়সীরা Rotaractor তারা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে রোটার‌্যাক্ট ক্লাবের মাধ্যমে এবং ৩০ বছর তদুর্দ্ধরা হলেন Rotarian, তাঁরা তাঁদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন Rotary Club এর মাধ্যমে। Early Act, Interact এবং Rotaract ক্লাব একটি Rotary Club এর অভিভাবকত্বে পরিচালিত হয়।

১৯৬৮ সালে Rotary Club এর অধীনে Rotaract Club তাদের কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে রোটার‌্যাক্ট কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৪ সালে। বর্তমানে বিশ্বের ১৫০টি দেশে ৮০০০টি রোটার‌্যাক্ট ক্লাবে ১,৮৪,০০০ এর বেশী সংখ্যক Rotaractor জড়িত আছে। যাদের উদ্দেশ্য– পেশাগত উন্নয়ন, নেতৃত্বের বিকাশ সাধন, সমাজ সেবা কার্যক্রম, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, বন্ধুত্ব তৈরী, আন্তর্জাতিক সমঝোতা, চিত্ত বিনোদন, নৈতিক চর্চা ও সুনাগরিক হওয়া। এর মূলমন্ত্র হলো- Fellowship Through Service প্রতি খ্রিষ্টীয় বা ঈসায়ী সনের ১লা জুলাই হতে ৩০ জুন সময়ের জন্য ক্লাবের কমিটি গঠন করা হয়। কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের তথা সমবয়সীদের কর্তৃক সংগঠিত হয় এবং একটি রোটারী অভিভাবক ক্লাব থাকে। এই সংগঠনের কার্যক্রম চারটি শ্রেণীতে বিভক্তঃ

ক) ক্লাব সেবা কার্যক্রম ঃ সভা, সদস্য বৃদ্ধি ও বাতিল, প্রকাশনা, জনসংযোগ, জেলা প্রকল্পে যোগদান, রোটার‌্যাক্ট সপ্তাহ পালন, বর্ষবরণ, দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন ইত্যাদি।

(খ) সমাজ সেবা কার্যক্রম ঃ ঔষধ বিতরণ, এতিমখানায় সহায়তা, জনসংখ্যা সচেতনতা, শিক্ষা প্রকল্প, বৃক্ষরোপন, চক্ষু শিবির, স্বেচ্ছায় রক্তদান, আর্থিক সহায়তা, সাংস্কৃতিক ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, বন্যায় ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচী ইত্যাদি।

(গ) পেশা উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ পেশা নির্বাচন প্রকল্প, শিল্প কারখানা পরিদর্শন, দোকানদারদের সাহায্য প্রদান, সেলাই মেশিন প্রদান, হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ, রোটারী যুব কার্যক্রম মাস উদ্‌যাপন, অবহেলিত পেশাজীবিদের সম্মানিতকরণ, রোটার‌্যাক্ট ট্রেনিং ক্যাম্প (RTC), Rotary Youth Leadership Award (RYLA), ফটোগ্রাফী কোর্স ইত্যাদি।

(ঘ) **আন্তর্জাতিক সেবা কার্যক্রম ঃ** জনসংযোগ, শুভেচ্ছা বিনিময়, আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপন, ডাক টিকিট, মুদ্রা ও ভিউ কার্ড প্রদর্শনী, আন্তর্জাতিক সন্ধ্যা, রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কার্যক্রম।

উপরোক্ত তিনটি জাতীয়/আন্তর্জাতিক যুব সংগঠন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হল। এ ছাড়া আমাদের দেশে বিএনসিসি, সবুজ সেনা, গার্ল-গাইডস এসোসিয়েশন, ফিলাটেলিষ্টস এসোসিয়েশন, টিআইবি ইয়েস গ্রুপ ইত্যাদি সহ আরোও অনেক যুব সংগঠন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এদের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে ফলাফল রিপোর্ট তৈরী করতে হলে ঐ সংগঠন সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত জানতে হবে। সংগঠনের একাধিক কর্মকর্তার সাথে যোগযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সম্ভব হলে তাদের প্রকাশনাসমূহ সংগ্রহ করতে হবে। তাহলেই পূর্ণাঙ্গ এবং কার্যপোযোগী রিপোর্ট তৈরী করা সম্ভব হবে।

০৫. সার্ক সহ অন্য যে কোন একটি আঞ্চলিক জোটের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

আঞ্চলিক জোট

নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি কল্পে বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন আঞ্চলিক জোট বা সহযোগীতা পরিষদের সৃষ্টি হয়েছে। পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষার্থে সদস্য দেশসমূহের পরস্পরের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষ্যে নতুন নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান এবং ক্ষেত্রসমূহে পারস্পরিক সহায়তা প্রদান, বিশ্ব শান্তি প্রক্রিয়ার অবদান ইত্যাদি লক্ষ্যে বর্তমানে কাজ করে যাচ্ছে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC), আরব লীগ, আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা (OAU), ন্যাটো (NATO), কমনওয়েলথ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM), ইউরোপীয়ান অর্থনৈতিক সম্প্রদায় (EEC) ইত্যাদি সংস্থাসমূহ। নিম্নে সার্ক ও আসিয়ান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগীতা সংস্থা বা সার্ক (SAARC) : সার্ক একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্থান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও আফগানিস্থানকে নিয়ে এই জোট গঠিত হয় এবং সর্বপ্রথম ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশের ঢাকায় এক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং চুড়ান্তভাবে সার্ক সনদ অনুমোদিত হয়।

বাংলাদেশ প্রথম সার্কের চিন্তা-ভাবনা করে এবং গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। দক্ষিণ এশিয়া দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রশ্ন বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মরহুম জিয়াউর রহমান ১৯৮০ সালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের নিকট এই প্রস্তাব পেশ করেন। সার্ক গঠনের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৮১, ১৯৮২, ১৯৮৩ সালে যথাক্রমে কলম্বো, ইসলামাবাদ ও ঢাকায় বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভূটান, মালদ্বীপ ও শ্রীলংকার সচিব পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৩ সালে ৩রা আগষ্ট ভারতের নয়া দিল্লীতে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের স্বাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার অনুষ্ঠানিক জন্ম।

উদ্দেশ্য ঃ

১। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

২। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি, সমাজিক প্রগতি ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করা।

৩। এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে ও যৌথ স্বনির্ভরতাকে উন্নত ও জোরদার করা।

৪। একে অন্যের সমস্যার পারস্পরিক আস্থা, সমঝোতা ও সহযোগীতার হস্ত প্রসার করা।

৫। আর্থ-সমাজিক, সাংস্কৃতিক, কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সক্রিয় ও পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান করা।

৬। আন্তর্জাতিক ফোরামে অভিন্ন স্বার্থে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করা।

নীতিমালা ঃ সার্বভৌম, সমতা, আঞ্চলিক অখন্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে সহযোগিতা।

সহযোগিতার ক্ষেত্র ঃ কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, টেলিযোগাযোগ, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা, ডাক যোগাযোগ, খেলাধুলা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, আবহাওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা।

এই সংস্থা প্রতি বছর একবার পর্যায়ক্রমে সদস্য দেশসমূহে তার রাষ্ট্র প্রধানদের নিয়ে অধিবেশন করে। সদস্য দেশসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত মন্ত্রীপরিষদ বছরে দুইবার বৈঠকে বসে। এ পরিষদ সংস্থার নীতি প্রণয়ন, অগ্রগতি পর্যালোচনা, সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র সনাক্তকরণ এবং প্রয়োজনবোধে অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

সদস্য দেশসমূহের পররাষ্ট্র সচিবদের সমম্বয়ে ষ্ট্যান্ডিং কমিটি আছে এবং প্রয়োজনানুসারে এই কমিটির বৈঠক বসে। সঠিক সমম্বয়, প্রকল্প ও কর্মসূচী অনুমোদন, আঞ্চলিক ও বহিঃ সম্পদ যোগানোর দায়িত্ব ছাড়াও এই কমিটি মন্ত্রী পরিষদের নিকট রিপোর্ট পেশ করে এবং নীতি ও সিদ্ধান্তের প্রশ্নে মতামত আহবান করে।

বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সমম্বয় সাধন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য রয়েছে একাধিক টেকনিক্যাল কমিটি। এর সচিবলায় নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে অবস্থিত। প্রথম মহাসচিব বাংলাদেশের জনাব আবুল এহসান এবং প্রথম চেয়ারম্যান বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। প্রতি বছর শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনকারী দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলন পর্যন্ত এর মেয়াদ থাকে।

আসিয়ান (ASEAN) ঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট হলো- আসিয়ান। প্রতিষ্ঠিত হয়- ৮ আগস্ট ১৯৬৭। সদস্য রাষ্ট্র- ১০টি।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, বিজ্ঞান, গবেষণা, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতির ঈর্ষণীয় একটি আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থা হল আসিয়ান (Association of South East Asian Nations)। এ সংস্থাটি জাতিসংঘের আওতার বাইরে অথচ তার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে আঞ্চলিক সহযোগিতার মধ্যে বিভিন্ন দেশের মাঝে যে সকল সংঘ বিদ্যমান আসিয়ান তাদের অন্যতম। সফলতার ঐতিহ্য নিয়ে আসিয়ান আজও গতিশীল এবং তৃতীয় বিশ্বে প্রেরণার উৎস।

গঠন- ১৯৬৭ সালের ০৮ আগস্ট থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে আসিয়ানের সদস্য রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের ব্যাংকক ঘোষণা স্বাক্ষরের মাধ্যমে আসিয়ান গঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে ০৬টি রাষ্ট্র নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১০। সদস্য দেশগুলো হল- ব্রুনাই, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইন। মূল অকম্যুনিষ্ট দেশগুলো তাদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা সংরক্ষণ, অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান এবং অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বিদ্রোহগত সমস্যা সমাধানের জন্যই আসিয়ান গঠন করে। এর সদর দফতর- ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় অবস্থিত।

কার্যাবলী-

১. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিসমূহের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রগতি এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য যৌথ প্রচেষ্টা চালানো।

২. জাতিসংঘের সনদ, ন্যায় বিচার এবং আইনের নিয়মাবলীসমূহকে শ্রদ্ধা করে আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করা।

৩. শিক্ষা, পেশা, কারিগরি এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একে অন্যকে প্রশিক্ষণ এবং গবেষণায় সুবিধা প্রদান বৃদ্ধি করা।

৪. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের কৃষি ও শিল্পের ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৫. একক বা যৌথভাবে মুক্ত, নিরপেক্ষ, শান্তির এলাকা গড়ে তোলা।

৬. দারিদ্রতা, ক্ষুধা, রোগ এবং নিরক্ষরতা দূর করা এবং জনগণের জীবন যাত্রার মান নিশ্চিত করা।

৭. প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও অন্যান্য দূর্যোগ মুহূর্তে নিজেদের সাধ্যানুসারে ত্রাণ সাহায্য বৃদ্ধি করা।

৮. সদস্য রাষ্ট্রসমূহ আসিয়ান সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কেবল শান্তি প্রক্রিয়ার বিশ্বাস করে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পার্থক্যগুলো দূর করা।

০৬. এপি রিজিওন ছাড়া বিশ্ব স্কাউট সংস্থাভূক্ত ০২টি অঞ্চলের স্কাউটিং আছে এমন ০২ টি দেশের ইতিহাস, কৃষ্টি, ভাষা, যোগাযোগ, খাদ্য ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

নিচে আরব রিজিওনের আওতাভুক্ত ও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনে মহিমান্বিত- মিশর (ইজিপ্ট) এবং ইউরোপ রিজিওনের আওতাভূক্ত ও স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা স্যার লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের জন্মভূমি- ইংল্যান্ড সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

মিশর ঃ পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম নগরী মিশর। এটি উত্তর আফ্রিকাতে অবস্থিত। যার পশ্চিমে লিবিয়া এবং ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে সুদান, উত্তরে ইসরাইল ও উপত্যকা এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর অবস্থিত।

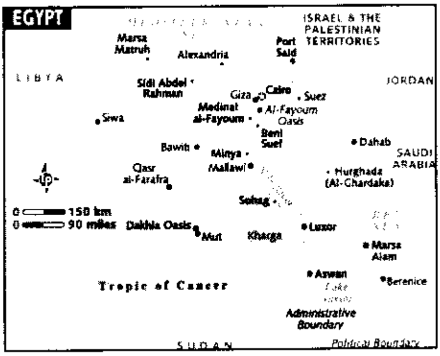

মিশরের আরব প্রজাতন্ত্র হল আরব বিশ্বের এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

মিশরে রয়েছে বিজ্ঞান, শিল্প, স্থাপত্য এবং অন্যান্য আরো অনেক কর্মকান্ডে যা ৭০০০ বছরের সভ্যতা এবং ইতিহাসের নিদর্শন। মিশরে রয়েছে গীজায় সর্বোচ্চ পিরামিড, স্কিংস, বিশ্বের সবচেয়ে পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় আল-আযাহার। এছাড়া সুয়েজ খাল যা লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে। সিনাই পর্বত উপত্যকা আফ্রিকা ও এশিয়াকে সংযুক্ত করেছে এবং নীল নদ হাজার বছর ধরে মিশরের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মিশরের রাষ্ট্রীয় ভাষা হচ্ছে আরবি এবং ইসলাম হচ্ছে রাষ্ট্রধর্ম। মিশরের প্রায় ৭ কোটি ১৯ লক্ষ লোক মুসলিম এবং কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টান, যারা পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন গীর্জার উপসনা করে। মিশর হচ্ছে রোমান ক্যাথলিক, গ্রীক সভ্যতা ও আরমেনিয়া সভ্যতার নিদর্শন। ১৯৪৮ সালে অধিকাংশ জিউস ধর্মাবলম্বী ইসরাইল নামের প্রদেশ গঠন করে।

মিশর আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের দ্বারা কিছু সময়ের জন্য এবং বিশেষ করে ইউরোপিয়ানদের কাছে অধিক জনপ্রিয়। মিশর শুধুমাত্র বিনোদনের জন্যই নয় পাশাপাশি রয়েছে বিখ্যাত পিরামিড, স্কিংস, শার্ম-আল শেখ, সাফাগা এবং হারযাদা ছাড়াও অনেক জনপ্রিয় ও পরিচিত স্থান-স্থাপনা রয়েছে।

মিশরের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব

* দাপ্তরিক নাম - আরবীয় প্রজাতন্ত্র মিশর
* পতাকা - লাল, সাদা এবং কাল এর সমন্বয় এবং সোনালী ঈগল যা মধ্যখানে অবস্থিত
* মুদ্রা - মিশরীয় পাউন্ড (এল. ই) ১ ইউ.এম= ৫.৭
* দাপ্তরিক ভাষা - আরবি
* রাজধানী - কায়রো অন্যান্য প্রধান শহর - আলেকজান্দ্রিয়া (মিশরের প্রধান বন্দর) তন্তা, পোর্ট সেইড, আশাওয়ান
* জাতীয় দিবস - ২৩ শে জুলাই, যা ১৯৫২ সালে স্বাধীনতা লাভ করে।
* অবস্থান - উত্তর আফ্রিকা, ২২ এর ৩২ সমান্তরাল এবং ২৪ ও ৩৭ অক্ষরেখায় অবস্থিত
* আয়তন - ১০০০২৫০ বর্গ কি.মি.
* জনসংখ্যা - ৭১.৯ মিলিয়ন
* বার্ষিক জনসংখ্যার গড় বৃদ্ধি - (২০০০-২০০৫) = ১.৯১%
* ১৫ বছর - ৬০ বছর মধ্যবর্তী জনংসংখ্যা = ৫৯%
* নারী- পুরুষ - ১০০ ঃ ১০০
* গড় আয়ু - ৬৮.৯ বছর (পুরুষ) ৭৩.৫ বছর (নারী)
* শহরে বাস করে - ৪২.১%

ইংল্যান্ড ঃ যুক্তরাজ্যের একটি অংশ হলো ইংল্যান্ড। এটি স্কটল্যান্ড এর সাথে উত্তরে এবং ওয়ালেস এর সাথে পশ্চিমে, আইরিশ সাগর, উত্তর পশ্চিমে এবং ক্যাথলিক সাগর দক্ষিণ-পশ্চিমে উত্তর সাগর পশ্চিমে, ইংলিশ চ্যালেন ইউরোপ থেকে ইংল্যান্ডকে পৃথক করেছে। প্যালোথিক সময়ে আধুনিক সভ্যতা দ্বারা ইংল্যান্ডের নামকরণ করা হয়। কিন্তু এই নামটি দেবদূত হতে গৃহিত। ইংল্যান্ড একটি সম্মিলিত প্রদেশে ৯২৭ শতাব্দীতে পরিণত হয়। আবিস্কারের জন্মলগ্ন থেকে ১৫ শতাব্দী পর্যন্ত এটি সাংস্কৃতিকভাবে বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত হয়। ইংরেজী ভাষা এ্যাংলিকান চার্চ এবং ইংরেজী আইন যা অনেক দেশেরই সাধারণ আইন যা ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত। ১৮০০ শতকে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব ঘটে যা ইংল্যান্ডকে বিশ্বের প্রথম শিল্প নগরীতে পরিণত করে। ইংল্যান্ডের সুশীল সমাজ আধুনিক গবেষনামূলক বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করে।

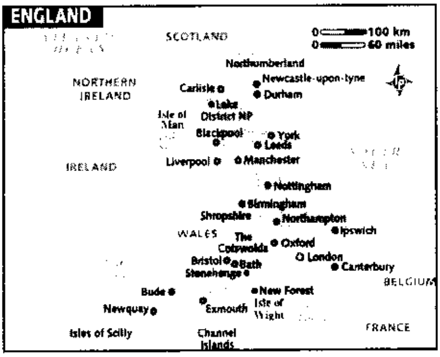

ইংল্যান্ড মূলত ঃ সমতল ও উঁচু ভূমি রয়েছে উত্তরে (যেমন- মাউন্টেউন লেক ডিসট্রিক, পেনিনেস এবং ইয়র্কশেয়ার (ডলস) এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে (উদাহরণ স্বরূপ-ডর্টেমুর এবং কোটসউলস)। লন্ডন হচ্ছে ইংল্যান্ডের রাজধানী যা সবচেয়ে বড় শহর এবং ইউরোপিয় ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় নগরী। ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা ৫১ মিলিয়ন এবং লন্ডনে ৮৪% জনসংখ্যা বসবাস করে। উনিশ শতকে ইহা সর্বপ্রথম শিল্প নগরীতে পরিণত হয়।

ইংল্যান্ডের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

* রাজধানী - লন্ডন

* দাপ্তরিক ভাষ - ইংরেজী

* এথনিক গ্রুপ (২০০৭) - ৮৮.২% শ্বেত; ৫.৭% দক্ষিণ এশিয়ার ২.৮% কৃষ্ণাঙ্গ; ১.৭% মিশ্রিত ০.৮% চীনা; ০.৭% অন্যান্য

* সরকার -অনুন্নত সাম্রাজ্যবাদ

* রাণী - এলিজাবেথ।

* প্রধানমন্ত্রী - ডেভিড ক্যামেরন

* লেগইজলাটার - যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট

* আয়তন - ১৩০.৩৯৫ বর্গ কি.মি/ ৫০৩৪৬ বর্গমাইল

০৭. রেকর্ড সংরক্ষণ ঃ

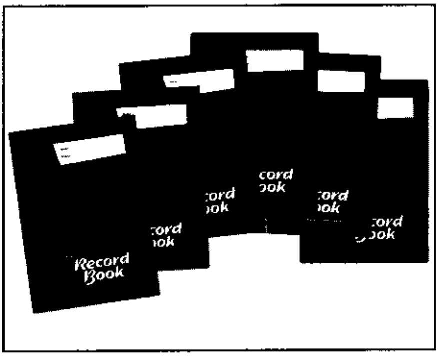

ক) আমার স্কাউট রেকর্ড বই সংরক্ষণ করা-

প্রতিটি বিষয় সম্পন্নের সাথে সাথে 'আমার স্কাউট রেকর্ড বইয়ে রোভার স্কাউট লিডার/ বিশেষজ্ঞের স্বাক্ষর নিতে হবে ।

খ) লগ বই লিপিবদ্ধ করা -

'আমার স্কাউট রেকর্ড বই'য়ের সাথে সাথে বই লেখার কাজ সম্পন্ন করতে হয় । কারণ পিআরএস অ্যাওয়ার্ড আবেদনের সময় তা জমা দিতে হয় ।

এজন্য পূর্বে অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে কারো 'লগ বই' সংগ্রহ করে অনুসরণ করা যেতে পারে । তবে হুবহু অনুসরণ (কপি) করা হলে তার যথার্থ বলে বিবেচিত হয় না ।

০৮. ব্যবহারিক দক্ষতা ঃ

ক) কমপক্ষে ০২টি পাইওনিয়ারিং প্রোজেক্ট তৈরী করা ।

শেয়ার লেগ, সি ছ, লেডার, ট্রাসেল লেগ, ট্রান্সপোর্টার, লিফ্টার, ট্রাইপট, ফ্ল্যাগ ষ্ট্যান্ড, ট্র্যাপেজ, পোল মাংকি, রোপ মাংকি, ষ্টীল টাওয়ার, অবজারবেশন টাওয়ার, পিরামিড টাওয়ার, ট্রাসেল ব্রিজ, ডেরিক, লেডার ব্রিজ, রোপ কমান্ডো, এরিয়েল রানওয়ে, ভেলা, মেরী গো রাউন্ড ইত্যাদি হতে কমপক্ষে দুটি (পূর্বের ০২টি ব্যতিত) ।

রোভার গ্রুপের অন্যান্য রোভার স্কাউটদের সাথে নিয়ে রোভার স্কাউট লিডার অথবা সিনিয়র রোভার মেটের তত্ত্বাবধানে ব্যবহারিক (তৈরী ও অতিক্রম) কাজ সম্পাদন করতে হবে ।

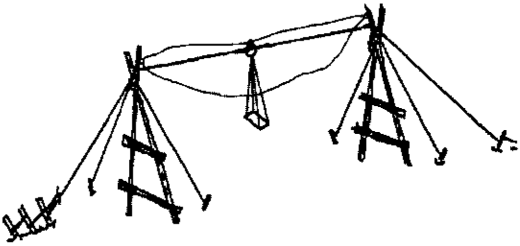

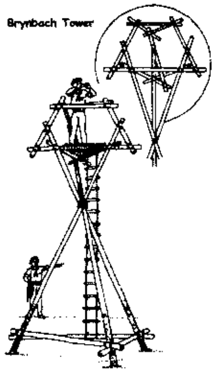

খ) বিশ্ব বন্ধুত্ব কার্যক্রম চালু রাখা ।

পূর্বের কার্যক্রম অব্যাহত রেখে নতুন করে অন্ততঃ একটি নতুন বন্ধু তৈরী করতে হবে । মনে রাখতে হবে স্কাউট, ননস্কাউট যে কারো সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা যেতে পারে । তবে নন স্কাউটের ক্ষেত্রে তাকে স্কাউট আন্দোলন সম্পর্কে নূন্যতম বিষয় অবহিত করলে ভাল হয় । মাধ্যম হিসেবে ডাক যোগাযোগ, ই-মেইল, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ ওয়েব সাইট (যেমন- ফেসবুক, টুাইটার, স্কাইপি) ব্যবহার করা যেতে পারে ।

গ) একটি এলাকা জরিপ করে রিপোর্ট প্রণয়ন করা ঃ

জরিপ ঃ সেবা স্তরের একজন রোভার স্কাউটকে তার "ব্যক্তিগত দক্ষতা" বিষয়সমূহ সফলভাবে শেষ করার জন্য তাকে শিখতে হবে জরিপ এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরী করা । এই স্তরে এসে তাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে- যেকোন একটি এলাকা জরিপ করে ফলাফলের উপর ভিত্তি করে তা সমাধানের লক্ষ্যে সুপারিশসহ পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরী ।

কোন এলাকা জরিপ করার জন্য প্রথমে এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিতে হবে । অর্থাৎ যে বিষয়সমূহ জরিপের আওতায় আসবে তা নির্দিষ্ট করা এবং সে বিষয়সমূহের কতটুকু গভীরে প্রবেশ করা হবে তাও ঠিক করে নেয়া । যেমন- পরিবার সদস্য সংখ্যা । এই তথ্যটি সরাসরি জানা যেতে পারে, মোট সদস্য কত অথবা বিভিন্ন বয়সে ভাগ করে কোন বয়সে কতজন সদস্য । ঠিক করে নিতে হবে তার কতটুকু প্রয়োজন । এছাড়া জরিপে গেলে প্রথমে সেই এলাকার লোকজনকে বুঝাতে হবে, তারা কোথা থেকে এসেছে, কেন জরিপ করছে এবং ফলাফল বা রিপোর্ট তাদেরকে কিভাবে সহায়তা করতে পারে । তা না হলে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে না । ফলে জরিপ ফলপ্রসূ হবে না । যেমন অনেকেই পরিবারের সদস্য সংখ্যা, মাসিক আয় বা গবাদি পশু পাখির সংখ্যা জানতে চাইলে মনে করে এর উপর ভিত্তি করে হয়ত তাদের উপর কর নির্ধারণ করা হবে, ফলে কমিয়ে বলে । এর ফলে জরিপের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় না । মনে রাখতে হবে যে, কোন বিষয় সম্মন্ধে তথ্য পাওয়ার বিজ্ঞানসম্মত উপায় হচ্ছে জরিপ ।

জরিপের পর সমস্যা নির্ধারণের সময় খুবই মনযোগী হতে হবে । যেমন- জনসংখ্যা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি আমাদের জন্য প্রকট এক সমস্যা । কিন্তু দেখা গেল কোন স্থানে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে বেশী, কিন্তু সে সাথে বেকার কম এবং শিক্ষিতের হারও বেশী । তাহলে এটা তেমন বড় সমস্যা নয় । আবার দেখা গেল এলাকার লোকজন সঠিকভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থার সহায়তা গ্রহণ করছে, কিন্তু সঠিক

স্থানে মলত্যাগ করছে না বা রান্নাসহ বিভিন্ন কাজে নালা, পুকুরের ময়লা পানি ব্যবহার করছে অথবা স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহার করছে, টিউবওয়েলের পানি পান করছে, কিন্তু সঠিক সময়ে টিকা বা ইনজেকশন নিচ্ছে না। এসব তথ্য সঠিকভাবে বিবেচনা করে সমস্যা নির্ধারণ করতে হবে এবং সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে তা দূরীকরণে জন্য পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব বা কিভাবে তা দূর করতে হবে সেই ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে সুপারিশমালা প্রণয়ন করতে হবে। এছাড়া প্রয়োজনে আরো তথ্য সন্নিবেশ করা যেতে পারে।

নমুনা জরিপ ফরম মোতাবেক একটি এলাকা জরিপ করে সে এলাকার উপর সম্যক ধারণা লাভের প্রেক্ষিতে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করতে হবে। যাতে এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থান ভূমিরূপ, শিল্প-কারখানা, কৃষিজ উৎপাদন, মানুষের দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ করতে হবে।

০৯. "পরিভ্রমণকারী ব্যাজ" অর্জন ঃ

পরিভ্রমণকারী ব্যাজ ঃ রোভার স্কাউট প্রোগ্রামের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং অপেক্ষাকৃত কম সময়ে অর্জিত এই ব্যাজ অর্জনের জন্য একজন রোভার স্কাউটকে নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ করতে হবে-

ক. যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় অনুমোদন গ্রহণ করে কাজ শুরু করতে হবে। যেমন- রোভার স্কাউট লিডার, গ্রুপ কমিটির সভাপতি, জেলা কমিশনার -এর অনুমোদন নিতে হবে।

খ. পরিভ্রমণ শেষে ১০ দিনের মধ্যে পরিভ্রমণের খসড়া মানচিত্র, ভ্রমণ বৃত্তান্ত অটোগ্রাফ বই, আয়-ব্যয়ের হিসাব, ছবি এবং অন্যান্য প্রামান্য তথ্য সহকারে খসড়া রিপোর্ট ইউনিট কাউন্সিল ও রোভার স্কাউট লিডারের নিকট পেশ করতে হবে। পরবর্তী ১ মাসের মধ্যে পরিভ্রমণের চূড়ান্ত রিপোর্ট (লগ বুক) রোভার স্কাউট লিডারের অনুমোদনসহ জেলা কমিশনারের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পৌঁছাতে হবে।

গ. পায়ে হেঁটে ১৫০ কিঃ মিঃ ৫ দিনে পরিভ্রমণ করতে হবে, অথবা

ঘ. সাইকেল যোগে ৫০০ কিঃ মিঃ ৫ দিনে পরিভ্রমণ করতে হবে, অথবা

ঙ. নৌকা যোগে ২৫০ কিঃ মিঃ ৫ দিনে পরিভ্রমণ করতে হবে।

চ. রোভার স্কাউট মেয়েরা পরিভ্রমণ দুই পর্বে ভাগ করেও করতে পারবে। তবে দুটি আলাদা রুট হতে হবে।

ছ. রোভার স্কাউট মেয়েরা অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিভ্রমণ করে এই ব্যাজ অর্জন করতে পারবে, তবে এজন্য একজন রোভার স্কাউটকে উল্লেখিত শর্তাবলী পূরণ করতে হবে (আলাদা/এককভাবে করা যাবে)।

জ. পরিভ্রমণের মাঝে অথবা চূড়ান্ত স্থান কোন ঐতিহাসিক স্থান হতে হবে। যেমন- পাহাড়ি পথ, ঐতিহাসিক স্থান, পুরাকৃতি স্থান, উপজাতি এলাকা ইত্যাদি।

১০. কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ঃ

MS Office (Excel), Networking সম্পর্কে জানা ঃ

MICROSOFT (MS) EXCEL: Excel is the most popular spreadsheet program that provides worksheet, chart, databases and list operations all in once software environment. Excel is used in automatic financial statements, business forecasting transaction registers, inventory control and accounts receivable and payable, financial modeling, scientific and engineering graphics and chart etc. The Excel application windows includes the standard title bar, status bar and command bars. Below the command bars is in a strip that contains the name box and formula bar.

How to start MS Excel?

Click on 'Start button' ▸ Select programs ▸ MS Office ▸ MS Excel.

How to open a MS Excel file?

File ▸ New ▸ Blank Document

How to change page set up?

File ▸ Page set up ▸ page ▸ OK

Margin settings of MS Excel file.

File ▸ Page set up ▸ Margin option (From the page set up dialogue box) ▸ OK

Way of Header and Footer settings.

File ▸ Page set up ▸ Header and Footer option ▸ OK

How to change sheet settings option?

Fiie ▸ Page set up ▸ Sheet option ▸ 0K

Way to storing a document.

File ▸ Save Selecting a name ▸ Save

[NB: Press Ctrl+S to save a file]

How to see print preview?

File ▸ Print preview ▸ close to go back to the document.

How to make a password protect file?

File ▸ Save as ▸ Tools ▸ Security option ▸ Type password ▸ OK

How to open a password protected file?

File ▸ Open ▸ Select target file ▸ Open ▸ Type using enter password to open file box ▸ OK

How to remove password from a file?

File ▸ Save as ▸ Tools ▸ Security option ▸ Delete all

NETWORKING:

Definition: A network is a set of technologies including hardware, software, media that can be used to connect computers together, enabling them to communicate, exchange information and share recourses in real time.

Uses of Network:

1. Simultaneous access to data.
2. Shared peripheral device.
3. Personal communication.
4. Easier data backup.

TYPES OF NETWORK:

There are two types of Network

1) Common types of Network

2) Hybrid types of Network

1) COMMON TYPES OF NETWORK: There are two main types of Network.

a) LAN

b) WAN

a) LAN: Local Area Network (LAN) is a data communication system consisting of several devices such as Computers, Printers.

- Contain printers, survers and Computers.
- Systems are close to each others.
- Contain in one office or building.
- Organizations often have several LANs.

b) WAN: A Wide Area Network (WAN) is two or more LANs connected together generally, across a wide geographical area.

- Two or more LANs connected.
- Cover a large geographic area.
- Typically use public or based line.

2) HYBRID TYPES OF NETWORK: There are three main types of Network.

a) CAN
b) MAN
c) PAN
d) HAN

a) CAN: Campus Area Network (CAN)

- A CAN is one large geographic area.
- Resources related to the same organization.
- Each department shares the CAN.

b) MAN: Metropolitan Area Network (MAN)

- A large Network what can connect different organizations.
- Share regional resources.
- A Network provider sells time.

c) PAN: Personal Area Network (PAN)

- Very small scale network.
- Range is less than two meters.
- Cell Phones, PDAc, MP3 players.

b) HAN: Home Area Network (HAN)

- A small scale Networking.
- Connect Computers and entertainment applications.
- Found mainly in the home.

১১. যেকোন একটি বিষয়ে পরিমিত জ্ঞানার্জন ঃ

ব্লাড ব্যাংক, চক্ষু ব্যাংক, চক্ষু শিবির, কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ, বৈমানিক, সীম্যান্স (নাবিক), রেলওয়ে পাইলট।

ব্লাড ব্যাংক ঃ

(১) রক্তের উপাদান, গঠন ও মানবদেহের রক্তের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যাবলী সম্পর্কে জানা।

(২) বিভিন্ন গ্রুপের রক্তের নাম জানা।

(৩) নিজ এলাকার ব্লাড ব্যাংক ও রক্তদান কেন্দ্রসমূহের নাম জানা।

(৪) রক্ত প্রাপ্তিস্থান ও প্রাপ্তি উপায়সমূহ জানা।

(৫) রক্তদানের উপকারিতা সম্পর্কে জানা।

(৬) রক্তদানের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা।

(৭) নিজের ব্লাড গ্রুপ সম্পর্কে জানা এবং অন্ততঃ দু'বার ব্লাড ব্যাংকে বা রক্তদান কেন্দ্রে রক্তদান করা।

(৮) দৈহিকভাবে রক্তদানে অক্ষম হলে অন্ততঃ দু'জন লোককে রক্তদান কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে রক্তদান করানো।

চক্ষু ব্যাংক ঃ

(১) চক্ষু ব্যাংকের অবস্থান সম্পর্কে ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা।

(২) চক্ষু ব্যাংকে চক্ষুদান পদ্ধতি সম্পর্কে জানা।

(৩) চক্ষু ব্যাংকের জন্য পুরাতন চশমা/চশমার ফ্রেম ও ঔষুধ সংগ্রহ করে চক্ষু ব্যাংকে জমাদান।

(৪) মরণোত্তর চক্ষুদানে জনসাধারণকে উৎসাহিত করা।

(৫) স্বেচ্ছায় মরণোত্তর চক্ষুদানের অঙ্গীকার করা, দৈহিকভাবে অক্ষম হলে কোন দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধুদ্ধ করে মরণোত্তর চক্ষুদানের জন্য এই ব্যাংকের প্রতিশ্রুতি পত্রে সই করতে সহযোগিতা/উদ্ধুদ্ধ করা।

চক্ষু শিবির ঃ

(১) নিজ এলাকায় চক্ষু রোগীদের তথ্য সংগ্রহ।

(২) বিভিন্ন প্রকার চক্ষু রোগ সম্পর্কে জানা।

(৩) যে সমস্ত চক্ষ রোগে অপারেশন দরকার হয় সে সম্পর্কে জানা।

(৪) কোন চক্ষু রোগীর অপারেশনের পূর্বে ও পরে রোগীর খাদ্য সম্পর্কে জানা ও খাদ্য প্রদানে সর্তকতা অবলম্বন করা।

(৫) অন্ততঃপক্ষে ০৫ জন চক্ষু রোগীকে মোটিভেট করে চিকিৎসার জন্য চক্ষু শিবিরে নিয়ে আসা।

৬) কোন চক্ষু শিবিরে অন্ততঃপক্ষে ৪৮ ঘন্টা সেবা কাজ এবং রোগীর যথাযথ পরিচর্যা করতে পারা।

কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ ঃ

(১) কুষ্ঠ রোগ কি ও কুষ্ঠ রোগের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানা।

(২) কুষ্ঠ রোগ কিভাবে ছড়ায়? কুষ্ঠ রোগের প্রাথমিক লক্ষণসমূহ কি কি?

(৩) কুষ্ঠ রোগ কিভাবে ভাল হয়?

(৪) কুষ্ঠ রোগে কেন বিকলাঙ্গ হয়?

(৫) কুষ্ঠ রোগের ফলে সুষ্ঠু বিকলাঙ্গ কিভাবে রোধ করা যায়?

(৬) কুষ্ঠ রোগ প্রতিরোধের উপায় কি কি?

বৈমানিক ঃ

(১) এয়ারম্যানশীপ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন।

(২) আবহাওয়া সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞান এবং বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণে এর ভূমিকা।

(৩) বিমান শরীরবিদ্যা সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞান অর্জন।

(৪) বিমানের মাধ্যমে অনুসন্ধান এবং উদ্ধার কাজ সম্পর্কে জ্ঞান।

(৫) বিমান নেভিগেশন সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান।

(৬) বিমানের ককপিট (Instruments & types of cockpit), সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান।

(৭) প্যারাসুট সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।

(৮) এটিসি (Air Traffic Control), মার্শালিং (Marshaling), মোর্স কোড (Morse Code) এবং উড্ডয়ন ও অবতরণ বাতি সংকেত (light Signal) সম্পর্কে জ্ঞান।

সিম্যান্স ঃ

(১) নৌ পথে চলার নিয়মাবলি সম্পর্কে জানা।

(২) বিভিন্ন প্রকার বয় সম্পর্কে জানা।

(৩) নৌ পথে জাহাজ চলাচলের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্ন (বাতি ও বল) সম্পর্কে জানা।

(৪) জাহাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার চার্ট সম্পর্কে ধারণা।

(৫) জাহাজে প্রচলিত বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক অভিবাদন সম্পর্কে বিস্তারিত জানা এবং প্রদর্শন করতে পারা।

(৬) জাহাজে ব্যবহৃত বোসন কল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং বাজাতে পারা।

(৭) পোতাশ্রয় ও বাতিঘর সম্পর্কে ধারণা।

(৮) সিমাফোর কি? বিভিন্ন প্রকার সিমাফোর সম্পর্কে জানা।

(৯) জলীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে জানা।

রেলওয়ে পাইলট ঃ

(১) রেল ইঞ্জিন সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন।

(২) রেল ইঞ্জিন শেড থেকে বাহিরে বের করার পূর্বের প্রাথমিক পরীক্ষা সম্পর্কে জানা।

(৩) রেল ইঞ্জিন শেড এবং রেল কারখানা পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ।

(৪) রেল ইঞ্জিনে করে ৪০০ কিঃ মিঃ ভ্রমণ করা এবং ভ্রমণকালে চালকের সাথে থাকা এবং চালককে সাহায্য করা।

(৫) অনুন্য ৫ দিন রেল স্টেশনে সেবা প্রদান।

১২. রোভার স্কাউটদের জন্য নির্বাচিত গান থেকে নতুন তিনটি গান জানা ও সুন্দরভাবে গাইতে পারা।

সেবা স্তরের স্কাউটদের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক নির্বাচিত গানগুলো হল-

১. ও আমার দেশের মাটি তোমার তরে ঠেকাই মাথা...
২. তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেবো রে...
৩. টাকডুম টাকডুম বাজাই বাজাই বাংলাদেশের ঢোল...
৪. চল্ চল্ চল্ উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল..
৫. চলে মচ্ মচ্ চলে মচ্ মচ্ সবচেয়ে ভাল পা গাড়ি...
৬. হে খোদা দয়াময় রাহমানু রাহিম...
৭. অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি বিচার দিনের স্বামী...

* প্রশিক্ষণ স্তরে শেখা গান বাদে নতুন তিনটি গান শিখতে হবে।

[বি.দ্র.: গানের সিডি বাংলাদেশ স্কাউটসের 'স্কাউট শপ' থেকে সংগ্রহ করা যাবে]

১৩. ধর্মীয় নিয়মাবলী ঃ

স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনের প্রতি দৃষ্টি রেখে ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ মেনে চলা ও অপরকে উদ্ধুদ্ধ করা।

খুব ভাল করে চোখ ফেললে বোঝা যাবে যে, স্কাউট আন্দোলন কখনো ধর্মীয় কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেনি বরং যারা আস্তিক কেবল তারাই এ আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে পারে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে পৃথিবীতে আসা যেমন সত্য তেমনি একদিন এখান থেকে চির বিদায় নিয়ে যেতে হবে। 'আমি কি পেলাম সেটা বড় কথা নয় বরং আমি কি দিলাম, সেটিই বড়' এমন কথাকে সামনে রেখে কাজ করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি একজন রোভার স্কাউট কখনো খারাপ, অশুভ, মন্দ কাজ করাতো দূরের কথা, সমর্থন পর্যন্ত করেনা। স্কাউট আইন ও প্রতিজ্ঞার

মাধ্যমে কাজ করলে একজন রোভার স্কাউট ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় তথা আন্তর্জাতিকভাবে ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠবে। একটি সুন্দর দালান তৈরির পর যেমন তা রক্ষার জন্য বিশ্বস্ত দারোয়ান অথবা তালার প্রয়োজন হয় তেমনি একজন সুন্দর মানুষ হয়ে চলতে গেলে ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় আস্থার প্রয়োজন। সকলে প্রশংসা করে- ভাল কাজ করলে, আর নিন্দা করে- অশুভ কাজে নিমজ্জিত হলে। তাই আমরা সবাই ব্যক্তি জীবনে ধর্মীয় কার্যাবলির সর্বোচ্চ প্রতিফলন ঘটিয়ে চলব এবং অপরকে চলতে উদ্বুদ্ধ করব।

১৪.স্কাউটিং ও সেবা কার্যক্রম ঃ

ক) নিজ ইউনিট ছাড়া অন্য একটি রোভার স্কাউট, একটি কাব স্কাউট ও একটি স্কাউট দল পরিদর্শন করে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রণয়ন।

একজন রোভার স্কাউটকে জানতে হবে কিভাবে অন্য একটি কাব স্কাউট/স্কাউট দল পরিদর্শন করে তাদের সংরক্ষিত নথিপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সেই দল সম্মন্ধে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করা যায়।

একজন রোভার স্কাউট এ স্তরে এসে দল পরিচালনায় বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করছে। তাই কিভাবে দল চলার নিয়ম? কিভাবে চলছে? বা কিভাবে ভালো ফলাফল পাওয়া যেতে পারে, এসব বিষয়ে তাকে বিশেষ জ্ঞান রাখতে হবে। এই জ্ঞান সে অর্জন করতে পারবে বা প্রসার ঘটাতে পারবে বিভিন্ন কাব স্কাউট অথবা স্কাউট দল পরিদর্শনের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম দেখে এবং দফতরে রক্ষিত তথ্যাবলীর মাধ্যমে। এই অর্জিত জ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ চাইলে, তাকে জানতে হবে রিপোর্ট তৈরী করা। পূর্বে সে এলাকা জরিপ করে সুপারিশ সহ রিপোর্ট তৈরি করে এই ব্যাপারে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করেছে। তাই এবার তাকে আরো দক্ষতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার পরিচয় দিতে হবে।

কোন দল পরিদর্শনে যেতে চাইলে প্রথমে নিজ দলের কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ঐ দলের কর্তৃপক্ষকে সময় ও তারিখ এর ব্যাপারে অবহিত পূর্বক তা পাকাপাকি করে ফেলতে হবে। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়েই তাকে ঐ দলের কার্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে, কারণ তাকে হয়তো গ্রহণ করার জন্য কমিটির সম্মানিত সদস্যরাও উপস্থিত থাকতে পারেন। এছাড়াও স্কাউটরা সময়ের সঠিক ব্যবহার করে। সঙ্গে নেয়া যেতে পারে নিজ দলের পক্ষ থেকে ঐ দলের জন্য কোন উপহার সামগ্রী। তা ছোট-বড় যাই হোক। দলে সদস্যদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ, আলাপ আলোচনা, দলের কার্যক্রম পরিদর্শন এবং তাদের দপ্তরে রক্ষিত তথ্যাবলি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

খ) পিআরএস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের নাম ও তথ্য জানা ঃ

কমপক্ষে ১০ (দশ) জন পিআরএস-এর নাম ও ঠিকানা জানা (কোন ইউনিট/গ্রুপ হতে ০১ জনের বেশি নয়) এবং সম্ভব হলে তাদের সাথে সরাসরি/ইন্টারনেটে যোগাযোগ স্থাপন করা।

- পিআরএস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের নাম ও ইউনিটের তালিকা জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক; গাজীপুর থেকে সহজেই পাওয়া যাবে।
- পিআরএস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের নাম ঠিকানা সম্বলিত তথ্যের বই বাংলাদেশ স্কাউটস এর 'স্কাউট শপ' -এ পাওয়া যায়।

গ) শাপলা/পিএস তৈরিতে সহযোগিতা প্রদান (অন্তত : ০১জন) ঃ

নিজ ইউনিট এলাকায়/সুবিধামত ইউনিটের কমপক্ষে ১জন কাব/স্কাউটকে শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড/ প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনের নিমিত্তে তার কার্যক্রম সমাপ্তিতে সহযোগিতা করে বাংলাদেশ স্কাউটসের নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করে উপজেলা ও জেলা স্কাউটসে আবেদন করতে পারা।

ঘ) অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন ঃ

গ্রুপ/জেলা/অঞ্চল/বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক অর্পিত কোন বিশেষ দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন। যেমন- দাপ্তরিক কাজ, টাস্কফোর্স সদস্য হিসাবে কাজ, লাইব্রেরী সাপোর্ট, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন, ক্যাম্পুরী/ জাম্বুরী/ মুট/ কমডেকা/ অ্যাগোনারী প্রস্তুতিতে দায়িত্ব পালন, কোন বিভাগের দাপ্তরিক কাজে সাপোর্ট দেওয়া প্রভৃতি।

দায়িত্ব পালনের বিষয়টি শুরুর পূর্বে জেলা রোভারকে অবহিত করতে হবে এবং কাজ শেষে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মকর্তার সনদ ও রোভার স্কাউট লিডারের সুপারিশের প্রেক্ষিতে জেলা কমিশনার এর নিকট হতে লিখিতভাবে কার্য সম্পাদনের সনদ গ্রহণ করে লগ বইয়ে সংযুক্ত করতে হবে। (জেলা রোভার স্কাউটসের অনুমোদন সাপেক্ষে রোভার অঞ্চল অথবা অন্য যেকোন স্কাউট অঞ্চলে দায়িত্ব পালন করা যেতে পারে)।

১৫. সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন ঃ

ক) পরিবেশ সংরক্ষণে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য দু'টি তথ্যবহুল চার্ট প্রস্তুত করে প্রদর্শন ও প্রচার করা।

পরিবেশ সংরক্ষণে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণে নমুনা শ্লোগানসমূহ-

০১. যদি পরিবেশ বাঁচাতে চান, বেশি করে গাছ লাগান।

০২. বেশী করে চারা রোপন করব, প্রকৃতিকে সুন্দর রাখব।

০৩. চারা রোপন বৃদ্ধি করি, কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) হ্রাস করি।

০৪. যদি গাছ নিধনকে বলি 'না', CFC বৃদ্ধি হবে না।

০৫. গাছ না থাকলে থাকবে না পৃথিবী প্রাণের অস্তিত্ব।

০৬. গাছ লাগাই, জীবন বাঁচাই।

০৭. গাছ কেটোনা, প্রকৃতিকে মরুভূমি বানিওনা।

০৮. বিশুদ্ধ অক্সিজেন (O_2) পেতে চাও, গাছ কাটা ছেড়ে দাও।

০৯. অক্সিজেন (O_2) ফ্যাক্টরী গড়তে চাই, বেশি বেশি চারা লাগাই।

১০. গাছ ধ্বংস করব না, পরিবেশ নষ্ট করব না।

১১. ঔষধি চারা বেশী লাগাই, ডাক্তারের কাছে ভিড় কমাই।

১২. ফলদ চারা বেশি করে লাগাই, ফল খেয়ে তাজা সতেজ হতে চাই।

১৩. যদি ঝড়ের কবল থেকে বাড়ি-ঘর রক্ষা করতে চাই, চলুন বাড়ির কাছে চারা গাছ লাগাই।

১৪. বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে চাও, ফলদ চারা বেশি লাগাও।

১৫. যদি বেশি ফল খেতে চাও, ফলদ চারা বেশি লাগাও।

১৬. পৃথিবীটা থাকবে সুন্দর যদি থাকে গাছ, থাকবে তুমি থাকবে মানুষের আশ (অস্তিত্ব)।

১৭. আয়ু সঞ্চয় করতে চান, তাড়াতাড়ি গাছ লাগান।

১৮. নানা বলে নাতিকে 'চল গাছ লাগাই', এই গাছ বিক্রি করে তোর বিয়ে দিতে চাই।

১৯. পরিবেশের প্রাণ মানুষ, মানুষের প্রাণ গাছ, সুতরাং গাছ লাগাই প্রাণ বাঁচাই।

২০. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালন করি, সবাইকে সচেতন করি।

২১. শোভন জীবন ও পৃথিবী গড়তে চারা রোপন জরুরী যেমন, এর পরিচর্চা ও সংরক্ষণ দরকার তেমন।

২২. গাছ লাগাই, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করি।

শ্লোগানগুলো পড়ি এবং অপরকে অবহিত করি।

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনঃ পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকেই বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট ঘটনা মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে চলছে যাকে দূর্যোগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। যেহেতু দূর্যোগের সাথে মানুষের জীবন জড়িত, তাই দুর্যোগের প্রশ্নে রোভারদেরও কিছু দায়িত্ব এসে পড়ে। এজন্য দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক দূর্যোগগুলো হলো-

১) বন্যা
২) ঘূর্ণিঝড়
৩) জলোচ্ছ্বাস
৪) খরা
৫) নদী ভাঙ্গন
৬) ভূমিকম্প ইত্যাদি

এসব দূর্যোগ বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই আঘাত হানে, বর্তমানে ভূমিকম্পের প্রভাব অনেক বেশি ও আশংকাজনক। যেহেতু এর কোন পূর্বভাস দেয়া সম্ভব হয় না। ফলে এতে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনাও বেশি। যে সকল দূর্যোগের ক্ষেত্রে পূর্বাভাস দেওয়া যায় সে বিষয়ে পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব।

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্তর
↓
পূর্ব সর্তকতা
↓
স্থানান্তর করা
↓
অনুসন্ধান, মুক্ত বা উদ্ধার কাজ
↓
প্রয়োজন, ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা
↓
ত্রাণ কার্যক্রম
↓
জরুরী পুনর্বাসন

পূর্ব সতর্কতার মধ্যে রয়েছে দূর্যোগ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন, দূর্যোগের পূর্বে পূর্বাভাস প্রচার করা, সমম্বয় সাধন, আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা ও উদ্ধার দল প্রস্তুত রাখা। দূর্যোগ আসার পূর্ব মুহুর্তে আশেপাশের জনগোষ্ঠিকে আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর করা।

দূর্যোগের পর অনুসন্ধান বা উদ্ধার কাজের জন্য বিভিন্ন রোগী বহন পদ্ধতি অনুসরণ করলে দ্রুত ও নিরাপদে কাজ করা সম্ভব হয়। বহন পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ক্রেডল বা পাঁজাকোলা, হ্যান্ড সিট, ফায়ার ম্যান লিফট এ্যান্ড ক্যারি, হিউম্যান ক্র্যাচ, পিক এ ব্যাক ইত্যাদি। এছাড়াও পানি থেকে উদ্ধারের জন্য সজ্ঞান মানুষকে দড়ির মাধ্যমে উদ্ধার করা যায়।

দূর্যোগের পর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও মানুষের ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে প্রয়োজনের ভিত্তিতে ত্রাণ কার্যক্রম চালাতে হবে।

দুর্যোগে আহত মানুষদের জন্য জরুরী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। যতটা সম্ভব প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে আহত ব্যক্তিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে এবং প্রচুর পরিমাণে খাবার স্যালাইনের ব্যবস্থা করতে হবে। পানি থেকে উদ্ধারের পর রোগীর শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

রোভার স্কাউটদের মূলমন্ত্র- 'সেবা'। এর প্রতিফলন যথাযথভাবে ঘটানো সম্ভব হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়। তাই প্রকৃত সেবা পরায়ণ ও কার্যকর রোভার স্কাউট হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও সে জ্ঞানকে কাজে লাগানোর কোন বিকল্প নেই।

গ) পূর্বের রোপনকৃত ০৪টি বৃক্ষের পরিচর্যা ও প্রতিবেদন পেশ ঃ

যে সকল চারা পূর্বে রোপিত হয়েছে সেগুলোর পরিচর্যা অব্যাহত রাখায় এখন তা বড় হয়ে ওঠেছে। এমন গাছের উপর প্রতিবেদন লিখতে হবে। প্রতিবেদন লিখার সময় গাছের বৃদ্ধি ও পরিবেশের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে উল্লেখ করতে হবে। লগ বইয়ে এ সকল গাছের অবস্থান নির্দেশ করে ছবি সংযোজন করা যেতে পারে।

১৬. স্বাস্থ্য পরিচর্যা ঃ

ক) হেপাটাইটিস-বি ও সি ভাইরাস এবং এইডস রোগ সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞানার্জনঃ

হেপাটাইটিস-বি

হেপাটাইটিস-বি এমন একটি ভাইরাস যা বিশ্বব্যাপী মারাত্মক রোগের জীবাণু হিসেবে পরিচিত। শিশুদের ব্যাপক হারে এ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে পৃথিবীতে প্রতি বছর ০২ থেকে ০৫ লাখ নবজাতক

হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে যারা ভবিষ্যতে এই রোগের বাহক হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ০৫ শতাংশ হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসে দীর্ঘমেয়াদী বাহক এবং এদের ২০ শতাংশ লিভার ক্যান্সার ও সিরোসিসের কারণে মারা যেতে পারে। বাস্তবে হেপাটাইটিস-বি এইডসের চেয়ে ১০০ গুণ বেশি সংক্রামক এবং প্রতিবছর এইডসের কারণে পৃথিবীতে যত লোক মৃত্যুবরণ করে তারচেয়ে বেশি মৃত্যুবরণ করে হেপাটাইটিস-বি এর কারণে।

বিশ্বব্যাপী হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস একটি ভয়াবহ স্বাস্থ্য সমস্যা। হেপাটাইটিস-বি এক ধরণের ভাইরাস যা মূলত লিভারকে আক্রমণ করে। এর সংক্রমণের ফলে পৃথিবীর অন্যতম ঘাতক ব্যাধি লিভার সিরোসিস ও লিভার ক্যান্সার হতে পারে। রক্ত ও রক্তজাত পদার্থ মূলত এই ভাইরাসের বাহক। প্রাথমিক পর্যায়ে এই ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী সাধারণত কোন লক্ষণ বহন করে না অথচ এদের মাধ্যমে অন্যরা সংক্রমিত হতে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে রক্তরস, লালা, বীর্য ও বুকের দুধ এক দেহ থেকে অন্য দেহে ভাইরাস বিস্তারে সহায়তা করে। সাধারণত আক্রান্ত মায়ের শিশু সন্তান আক্রান্ত পরিবারের অন্যান্য সদস্য বহুবার রক্ত গ্রহণকারী রোগী, মাদকাসক্ত ব্যক্তি, মানসিক অবসাদগ্রস্থ ব্যক্তি, স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তথা হাসপাতালে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ (যেমন- চিকিৎসা সেবিকা, ল্যাবরেটরিতে কর্মরত ব্যক্তি, দন্ত রোগের চিকিৎসা) এই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে।

হেপাটাইটিস-বি এর ইতিহাস ঃ

ইতিহাসে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে হিপোক্রেটিসের আমলে মহামারী হিসেবে জন্ডিসের কথা পাওয়া যায়। তবে ড. সাউল ক্রুগম্যান ১৯৫০ সালে একদল মানসিক রোগীর উপর গবেষণা চালিয়ে প্রথম এ ভাইরাসটি শনাক্ত করেন। তার দেয়া তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে ড. ব্লুমবার্গ হেপাটাইটিস-বি ভ্যাক্সিন তৈরি করেন। বর্তমানে ড. ব্লুমবার্গ এর তৈরিকৃত ভ্যাক্সিন এর পরিবর্তে রিকমবিন্যান্ট ভ্যাক্সিন ব্যবহার করা হয়।

আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ঃ

১। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অধিবাসী। যেমন- সাব সাহারা, আফ্রিকা, এশিয়ার অধিকাংশ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসী ও আলাস্কার আদি অধিবাসীদের মধ্যে হেপাটাইটিস-বি রোগের প্রকোপ অন্যদের তুলনায় অধিক। এ সকল এলাকার অধিবাসীদের হেপাটাইটিস-বি তে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশী।

২। যারা রক্ত ক্ষরণ ও অন্যান্য কারণে সৃষ্ট রক্ত শূন্যতার চিকিৎসায় বার বার ব্লাড ট্রান্সফিউশন করেন।

৩। সমকামী পুরুষদের মধ্যে যৌন মিলনের ফলে। হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসে সংক্রমিত নারী পুরুষের মধ্যে একাধিক নারী পুরুষের সঙ্গে যৌন মিলন।

৪। ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক দ্রব্য সেবন।

৫। একই নিডল ও সিরিঞ্জের মাধ্যমে একাধিক ব্যক্তির মাদক দ্রব্য গ্রহণ।

৬। রোগীর দেহ থেকে রক্ত সংগ্রহ। স্যালাইন বা ইনজেকশনের মাধ্যমে ওষুধ প্রয়োগ করার সময় কিংবা ল্যাবরেটরিতে রক্ত ও রোগীর দেহ থেকে সংগৃহীত তরল পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করার সময় অসাবধানতার কারণে।

৭। হেপাটাইটিস-বি সংক্রমিত রক্ত বিংবা অন্য তরল জাতীয় পদার্থ স্বাস্থ্য কর্মীদের রক্তের সংস্পর্শে এলে।

৮। হেপাটাইটিস-বি রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক এ ধরণের এলাকায় ছয় মাসের অধিক সময় অবস্থান করা।

৯। নার্সিং হোমে দীর্ঘ সময়ের জন্য অবস্থান বা কর্মরত থাকা।

১০। এছাড়াও হেপাটাইটিস-বি তে আক্রান্ত মায়ের গর্ভজাত সন্তানদের মায়ের গর্ভে জন্ম নেয়া সন্তানদের তুলনায় হেপাটাইটিস-বি তে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অধিক।

শিশুদের মধ্যে সংক্রমণ ঃ

হেপাটাইটিস-বি তে নবজাতকরা পিতা-মাতার মাধ্যমে আক্রান্ত হতে পারে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস জন্মের সময় বাহক মা থেকে শিশুর মধ্যে সংক্রমিত হয়। এ ধরণের সংক্রমণকে ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন বলা হয়। এছাড়া শৈশবে ও কৈশোরে খেলাধূলার সময় আঁচড়ের মাধ্যমে বাহক শিশু থেকে সুস্থ শিশুতে এ রোগ ছাড়াতে পারে। একইভাবে সুঁচের মাধ্যমে নাক কান ফুটো করার মাধ্যমে সংক্রমিত হতে পারে। আবার অশোধিত সিরিঞ্জ ও সুঁচ দ্বারা এবং চুল কাটার সময়ও সংক্রমণ ঘটতে পারে।

উপসর্গ ঃ

১। এক-তৃতীয়াংশ লোক কিছুই বুঝতে পারেন না।

২। এক-তৃতীয়াংশ লোকের ফ্লুর মতো মাথা ব্যাথা, গা শিরশির এবং জ্বর হয়।

৩। এক-তৃতীয়াংশ লোকের জন্ডিস, ক্ষুধামন্দা, ডায়রিয়া, বমি ও জ্বর দেখা যায়।

দীর্ঘ মেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব ঃ

হেপাটাইটিস-বি তে আক্রান্ত রোগীদের অধিকাংশই কোন প্রকার চিকিৎসা ব্যতিরেকেই আরোগ্য লাভ করে থাকে। পাঁচ বছর বয়সের আগে আক্রান্ত শিশুদের শতকরা ৯০ জনই লিভারের ক্রনিক বা দীর্ঘ মেয়াদি প্রদাহে ভুগতে থাকে। বয়স্কদের মধ্যে এ সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ থেকে দশ ভাগ। ক্রনিক প্রদাহে আক্রান্ত রোগীদের শতকরা একজন প্রতি বছর চিকিৎসা ছাড়াই জীবাণু বিমুক্ত হয় আর শতকরা ৩০ জন লিভার সিরোসিসের মতো মারাত্মক জটিলতায় ভুগতে থাকে। ক্রনিক হেপাটাইটিস-বি তে আক্রান্ত রোগীদের শতকরা পাঁচ থেকে দশজন লিভার ক্যান্সার বা হেপাটোসেলুলার কারসিনোমায় আক্রান্ত হয়।

হেপাটাইটিস-বি নিবারণের উপায় ঃ

রোগের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের অস্তিত্ব শনাক্ত করতে হবে। সাধারণত রক্তে হেপাটাইটিস-বি সারফেস অ্যান্টিজেন হেপাটাইটিস-বি আইজিএম কোর অ্যান্টিজেন হেপাটাইটিস-বি এন্টিজেন ও সেই সঙ্গে লিভার এনজাইমের অধিক মাত্রা নিশ্চিত হওয়ার জন্য রক্তে হেপাটাইটিস-বি সারফেস অ্যান্টিজেনের দীর্ঘ মেয়াদি উপস্থিতি হেপাটাইটিস-বি কোর আইজিজি অ্যান্টিজেন হেপাটাইটিস ই এন্ডিজেন ও লিভার এনজাইম পরীক্ষা অত্যন্ত জরুরি। আর সময়ের ব্যবধানে বি ভাইরাস দেহ থেকে নিসৃত হয়ে গেলে রক্তে হেপাটাইটিস-বি সারফেস অ্যান্টিজেনের মাত্রা হ্রাস পেয়ে এক সময় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে এবং ভবিষ্যতের জন্য হেপাটাইটিস-বি প্রতিরোধক হেপাটাইটিস-বি কোর এন্ডিবডি ও বি সারফেস অ্যান্টিবডি তৈরি করে। কতগুলো বিষয়ে সর্তক থাকলে এ রোগ থেকে দূরে থাকা সম্ভব।

১। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা

২। ইনজেকশন ব্যবহারের সময় ডিসপোসিবল সিরিজ ব্যবহার করা।

৩। দাঁতের চিকিৎসার সময় জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া

৪। রোগের বিরুদ্ধে নিজের শরীরে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। হেপাটাইটিস-বি-র টিকা ৪টি ডোজ নেওয়া। প্রথম তিনটি ১ মাস পর পর এবং চতুর্থ ডোজটি প্রথম ডোজের ১ বছর পর নিতে হয়।

চিকিৎসা ঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সব নবজাতককে হেপাটাইটিস-বির টিকা নেয়া অত্যন্ত জরুরি বলে ঘোষণা করেছে এবং ইতোমধ্যে ৮০টির বেশি দেশ এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে টিকা দেয়ার সম্প্রসারিত কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সরকার সকল শিশুকে

হেপাটাইটিস-বি ভ্যাক্সিন দেয়ার জন্য একে ইপিআই ভ্যাক্সিন কার্যক্রমের অর্ন্তভূক্ত করেছে। এ টিকা যে কোনো বয়সে যে কোনো দিন নেয়া যায়। শতকরা নব্বাই ভাগ মানুষের শরীরে এই ভ্যাক্সিন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলে। নীরব ঘাতক এ সংক্রামক ব্যাধিটি প্রতি মিনিটে কেড়ে দুজন নারী পুরুষের প্রাণ। প্রতি বছর ১০-৩০ মিলিয়ন মানুষ নতুন করে হেপাটাইটিস-বি তে আক্রান্ত হচ্ছে। এ রোগ থেকে মুক্ত থাকতে সবার প্রতিষেকমূলক ব্যবস্থা নেয়া উচিত। সর্বোপরি এ মহামারী থেকে বাঁচার জন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে।

হেপাটাইটিস-সি

হেপাটাইটিস-সি এমন একটি ভাইরাস যা বিশ্বব্যাপী মারাত্মক সংক্রামক রোগের জীবাণু হিসেবে পরিচিত। এ ভাইরাসের ফলে জন্ডিস থেকে শুরু করে লিভার সিরোসিস এমনকি লিভার ক্যান্সার হতে পারে। ১৯৮৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ ভাইরাস শনাক্ত করা হয়। হেপাটাইটিস-সি নামক ভাইরাসটি লিভার কোষ ধ্বংস করে ফেলে লিভার প্রদাহের সৃষ্টি হয় ও লিভারের কোষ ধ্বংস অব্যাহত থাকে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর মতে বিশ্বের প্রায় ১৭ কোটি মানুষ এ ভাইরাসে আক্রান্ত এবং প্রতি বছর ৩০-৪০ লাখ মানুষ এ ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশেও শতকরা ৩/৬ ভাগ লাকে হেপাটাইটিস-সি ভাইরাসের বাহক। বর্তমানে বাংলাদেশে পেশাদার মধ্যে শতকরা ২৪.১ ভাগ লিভার ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে শতকরা ৯.৬ ভাগ রক্ত গ্রহণের পর জন্ডিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ৬.৮ ভাগ স্বল্পস্থায়ী জন্ডিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ১.৭ ভাগ রোগী হেপাটাইটিস-সি ভাইরাসে আক্রান্ত। এইচআইভি বা এইডস রোগের চেয়ে ১০ গুন বেশি সংক্রামক হলো হেপাটাইটিস-সি।

হেপাটাইটিস যেভাবে ছড়ায় ঃ

হেপাটাইটিস-সি পরিসঞ্চালনের মাধ্যমে ছড়ায়। তাই সেভিং রেজার, ক্ষুর, ব্লেড, টুথ ব্রাশ ও ইনজেকশনের সিরিঞ্জ একাধিক ব্যবহার করলেও হেপাটাইটিস-সি ভাইরাস ছড়াতে পারে।

হেপাটাইটিস-সি ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা না নিলে ঃ

হেপাটাইটিস-সি এর ভাইরাস ধীরে ধীরে লিভারকে ধ্বংস করে। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি বুঝতে পারে না যে সে হেপাটাইটিস-সি ভাইরাসে আক্রান্ত এবং আজ পর্যন্ত এ রোগের কোনো কার্যকরী ওষুধ ও প্রতিষেধক আবিস্কার হয়নি যা হয়েছে তা অনেক ব্যয়বহুল ও অনিশ্চিত। তাই এ রোগ থেকে বাঁচতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়ে জোর দেওয়া উচিত।

১। রক্ত পরিসঞ্চালনের আগে হেপাটাইটিস-সি এর উপস্থিতি নির্ণয় করার জন্য সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে রক্তদান কেন্দ্র গুলোতে নির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা বাড়াতে হবে।

২। সেলুনে সেভ করা পরিহার করতে হবে এবং প্রতিজনের জন্য আলাদা আলাদা ব্লেড ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা উচিত।

৩। সর্বক্ষেত্রে ডিসপোজিবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে।

৪। রক্ত নেয়া বা রক্ত জাতীয় পদার্থ (প্লাটিলেট প্লাজমা) তৈরির ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস-সি ভাইরাস মুক্ত রক্ত ব্যবহার করতে হবে।

৫। অঙ্গ সংস্থাপনের ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস-সি পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা উচিত।

৬। ইনজেকশনের যন্ত্রপাতি পরস্পর ব্যবহার না করা।

৭। ব্যক্তিগত টয়লেট দ্রব্য যেমন- রেজার, টুথ ব্রাশ, নেল ক্লিপার এবং ত্বক ফোটানো ও রক্ত গ্রহণের যন্ত্রপাতি অন্য কেউ ব্যবহার না করা।

৮। হাতের কাছে ফাষ্ট এইড কিট রাখা।

৯। ত্বকে কাটা ছেঁড়া ক্ষত পরিস্কার রাখা ও ওয়াটার প্রুফ ব্যান্ডেজ দিয়ে ঢেকে রাখা।

হেপাটাইটিস-সি আক্রান্তদের করণীয় ঃ

১। নিয়মিত চিকিৎসা নেবেন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী জীবন-যাপন করবেন।

২। মনকে প্রফুল্ল রাখবেন ও ভাইরাস নিয়ে চিন্তা করবেন না।

৩। বাইরের সেলুনে সেভ করবেন না এমনকি বাসায় আপনার রেজার অত্যন্ত নিরাপদ স্থানে রাখবেন।

৪। কাউকে রক্ত বা কিডনি দেবেন না।

হেপাটাইটিস-সি ভাইরাসের লক্ষণগুলো ঃ

সাধারণত এ ভাইরাসে আক্রান্তদের ৫/১০ বছরের মধ্যে কোন লক্ষণ থাকে না। অধিকাংশ ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর শরীর ম্যাজম্যাজ করে অনেকের হাত পায়ের পাতা গরম থাকে এবং চোখ জ্বালা করে। আহারে রুচি কম থাকে এবং পেটের পীড়ায় ভুগতে থাকে। অনেকে সাদা আমযুক্ত মলত্যাগও করে। তবে এ রোগের দীর্ঘমেয়াদি ফলশ্রুতি হলো লিভার সিরোসিস লিভার ফেলিউর রক্ত বমি পেটে পানি জমা এবং লিভার ক্যান্সার।

হেপাটাইটিস-সি রোগের চিকিৎসা ঃ

এ ভাইরাসের এখন পর্যন্ত খুব কার্যকরি কোনো টিকা বা ভ্যাকসিন আবিস্কৃত না হওয়ায় এর প্রতিরোধই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক অবস্থায় এ ভাইরাস শনাক্ত

করা গেলে এর চিকিৎসা সম্ভব। নব্বই দশকের প্রথম দিকে ষ্টান্ডার্ড ইন্টারফেরন ইনজেকশন দিয়ে শুরু হয় এ রোগের চিকিৎসা। এ সময়ে শতকরা ৫-১৫ ভাগ রোগী চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদি ভাল হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতেছে। এই চিকিৎসার ফলে ৮০ ভাগ ও তদুর্ধ্ব রোগী দীর্ঘমেয়াদিভাবে ভাইরাসমুক্ত হতে পারেন। তবে ইন্টাফেরন চিকিৎসা কার্যকর হওয়া নির্ভর করে চিকিৎসা পদ্ধতি, সি ভাইরাসের জেনোটাইপ রক্তে সি ভাইরাসের মাত্রা আক্রান্ত লিভারের ফাইরাস টিস্যু জমার স্তর মদ্যপানে ও অন্যান্য ভাইরাসের উপস্থিতি লিভারে চর্বি ও আয়রন জমাসহ বিভিন্ন কারণের ওপর। বর্তমানে বাংলাদেশে হেপাটাইটিস রোগ চিকিৎসার প্রচলিত সব ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে। নীরব ঘাতক এ সংক্রামক ব্যধিটি এইডস জন্ডিসের চেয়ে ভয়ংকর। তাই এ রোগ থেকে মুক্ত থাকতে সবাইকে সচেতন হতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

এইডস

বর্তমান বিশ্বের বহুল পরিচিত একটি নাম এইডস (AIDS)। এটি এটি মরণব্যধি। এইডস এর পুরো অর্থ একোয়ার্ড এমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম। এইডস এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত রোগ। উন্নত-অনুন্নত সকল দেশেই এইচআইভি আক্রান্ত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ নারী, পুরুষ ও শিশু। বিশেষ করে ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সী মানুষ বেশি আক্রান্ত হয়। এইডস প্রথম শনাক্ত করা হয় আমেরিকাতে ১৯৮১ সালে। তবে প্রথম দেখা যায় ১৯৭০ সালের শেষ দিকে আফ্রিকার বিষুবীয় অঞ্চলে এবং ১৯৭৮ সালে যুক্তরাজ্যে। এইচআইভি ভাইরাস রক্তের শ্বেত কণিকাগুলোকে নষ্ট করে দেয়। ফলে এইচআইভি আক্রমণে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। যার ফলে যেকোন ধরণের রোগে শরীর খুব তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে।

বিশ্বজুড়ে এইডস আক্রান্তের পরিসংখ্যান ঃ

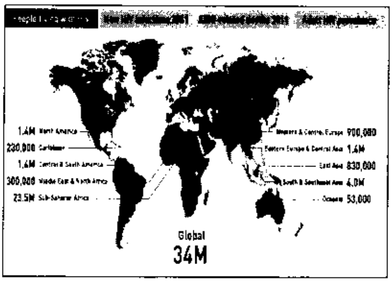

২০০৫ সালে পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবী জুড়ে ৪০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ এইচআইভ ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত আক্রান্তদের মধ্যে অনেকেই জানে না তারা এই ভাইরাস বহন করছে এবং এটা অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে যেতে পারে। এই মহামারীর শুরুতেই বিশ্বে ৩০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ এইডস আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। এর মধ্যে আমেরিকান ছিল ৫ লাখেরও বেশি। শুধু ২০০৫ সালেই মৃত্যুবরণ করেছে ৩.১ মিলিয়ন মানুষ।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নারী ও নেশা গ্রহণকারীদের মধ্যে সংক্রমণ যথেষ্ট বেড়েছে। ১৯৯৭ সালে এইআইভি সংক্রমিতদের ৪১ শতাংশ ছিল নারী, ২০০৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ। এশিয়া অঞ্চলে ২০০৫ সালের আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী ৮.৩ মিলিয়ন মানুষ এ ইচআইভি সংক্রমিত হয়েছে যার মধ্যে ২ মিলিয়ন হলো নারী। ২০০৫ সালে প্রায় ০.৪ মিলিয়ন মানুষ এ অঞ্চলে মৃত্যু বরণ করেছে এবং প্রায় দ্বিগুন ১.১ মিলিয়ন নতুন করে এইচআইভি দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে। এশিয়া অঞ্চলে ভারত ও চীনে এইচআইভি সংক্রমন মহামারী আকার ধারণ করেছে। সারা পৃথিবীতে ১৩ মিলিয়নেরও অধিক শিশু এইডস- এর কারণে এতিম হয়েছে।

বাংলাদেশে এইডস আক্রান্তের সংখ্যা

সরকারী তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৮৯ সালে একজন পুরুষের শরীরে এইচআইভি ভাইরাস পাওয়া যায়। ১৯৯১ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৯ জনে। এর মধ্যে দুজন ছিলেন নারী তারপর থেকে প্রতি বছরই এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে। গত বছর নতুন ১১৫ জন সহ এ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে আক্রান্তের সংখ্যা মোট ৪৬৫ জন। এর মধ্যে এইডস হয়েছে ৮৭ জনের এবং মারা গেছেন ৪৪ জন। অন্যদিকে এইডস সম্পর্কিত যৌথ জাতিসংঘ (ইউএনএইডস) এর রিপোর্ট অন দি গ্লোবাল এইচআইভি/এইডস এপিডেমিক ২০০২ প্রতিবেদন মতে বাংলাদেশে এইচআইভি/ এইডস আক্রান্তের সংখ্যা ১৩ হাজার। সরকারের সেপ্টেম্বর ২০০৫- এর ষষ্ঠ পর্যায়ের জরিপ প্রতিবেদন থেকে জানা যায় সার্বিকভাবে বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের হার আগের তুলনায় বেড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের হার যদি শতকরা ৫ ভাগ ছাড়িয়ে যায় তা হলে তাকে মহামারি বলতে হবে। এই হিসাব অনুসারে দেশে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহীতাদের মধ্যে এ হার মহামারি পর্যায়ে পৌছে গেছে। জরিপ অনুযায়ী ৭০ ভাগের বেশি মাদক গ্রহণকারী নিজেদের মধ্যে সিরিঞ্জ বিনিময় করে। ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহীতারা এইচআইভি/এইডস বিস্তারের ক্ষেত্রে উদ্বেগ সৃষ্টি করছে।

এইডস আক্রান্ত মানুষের নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়

১। শরীরের ওজন কমে যাওয়া
২। ক্লান্তি বোধ করা
৩। দীর্ঘদিন ধরে জ্বর থাকা
৪। মুখে বা গলায় ঘা
৫। বমি বমি ভাব বা বমি

৬। এক মাসের বেশি সময় ধরে ডায়রিয়া
৭। মথা চোখ এবং মাংস পেশিতে ব্যাথা
৮। গা ম্যাজ ম্যাজ করা
৯। চর্মের ওপর নানা ধরনের ফুসকুড়ি
১০। নাক কান গলার সমস্যা
১১। ঠোঁট ও যৌন অঙ্গের চারপাশে ধীরে ধীরে ফোসকা ও ঘা ছড়িয়ে পড়ে।

এইডস রোগের উৎস

১। রক্ত (Blood)
২। সিমেন (Semen)
৩। সারভাইকো ভেজাইনাল সিক্রেশন (Secretion)
৪। লাল (Saliva)
৫। বুকের দুধ
৬। সি.এস.এফ (CSF)

এইডস যেভাবে ছড়াতে পারে

১। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে কনডম ছাড়া যৌন মিলন করলে
২। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত সঙ্গে অন্য কোন ব্যক্তি গ্রহণ করলে
৩। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যেমন- সুঁচ, চাকু, কাঁচি, ব্লেড, ক্ষুর, সিরিঞ্জ ইত্যাদি ব্যবহার করলে
৪। একই সিরিঞ্জ দিয়ে শিরার মাধ্যমে একাধিক ব্যক্তি মাদকদ্রব্য ব্যবহার করলে
৫। এইডস আক্রান্ত নারী গর্ভধারণ করলে গর্ভের সন্তানেরও এইডস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে
৬। এইডস আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধ পানের মাধ্যমে শিশু এইডস আক্রান্ত হতে পারে।

এইডস যেভাবে ছড়ায় না

এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যে সব আচারণ এইডসের ঝুঁকি নেই

১। হাতে হাত মিলালে বা কোলাকুলি করলে
২। এক সঙ্গে বসবাস খাওয়া দাওয়া বা খেলাধূলা করলে
৩। একত্রে গোসল করলে বা একই পুকুরে গোসল করলে
৪। হাঁচি কাশি ও থুথুর মাধ্যমে
৫। বিড়াল, কুকুর বা গৃহপালিত পশু-পাখি হাত দিয়ে স্পর্শ করলে
৬। রোগীর সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমালে বা রোগীর জামা-কাপড়, তোয়ালে-গামছা, থালা-বাসন, গ্লাস ব্যবহার করলে

৭। একই পায়খানা ব্যবহার করলে

৮। রোগীদের স্পর্শ করলে

৯। খাদ্য পানীয়, মশা, মাছি , উঁকুন, আরশোলা, তেলাপোকা বা অন্য কোন কীটপতঙ্গের মাধ্যমে এইডস ছড়ায় না।

এইডস প্রতিরোধ করণীয় ঃ

ব্যক্তিগত পদক্ষেপ

১। স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া অন্যকোন নারী বা পুরুষের সঙ্গে দৈনিক মিলন অনুচিত

২। যৌন মিলনে প্রয়োজনে কনডম ব্যবহার করা উচিত

৩। অপরের দাড়ি কামানোর ব্লেড-ক্ষুর ব্যবহার করা উচিত নয়

৪। একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে যৌন মিলন করা ঠিক নয়

৫। মাদকদ্রব্য ব্যবহার বন্ধ করতে হবে

৬। এইডস আক্রান্ত মহিলাদের গর্ভধারণ করা উচিত নয়

৭। রক্ত গ্রহণ করার পূর্বে এইচআইভি পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত

৮। সুঁচ ও সিরিঞ্জ একবার ব্যবহার করা উচিত

৯। অস্ত্রপচারের ক্ষেত্রে ডাক্তারদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত

১০। বিয়ের আগে দৈহিক মেলামেশা করা উচিত নয়

সম্মিলিত পদক্ষেপ

সাধারণ মানুষের মধ্যে এইডস সম্পর্কে তেমন কোন ধারণার দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ এইডস প্রতিরোধ করতে হলে জনসাধারণের মধ্যে এই বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এ সম্পর্কে সচেতন করতে সম্মিলিতভাবে নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা উচিত-

১। মাধ্যমিক পর্যায় থেকে শুরু করে প্রতি স্তরের পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে এইডস এর সচেতনতা সম্পর্কে একটি অধ্যায় সংযুক্ত করা। স্কুলের শিক্ষকদের উচিত এইডস সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের গল্প বা কার্টুন দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে উপস্থাপন করা যেন ব্যাপারটা তাদের কাছে সহজবোধ্য হয়।

২। পেশাদার রক্তদাতাদের রক্ত প্রদানে বাঁধা প্রদান করতে হবে। আইন প্রণয়ণের মাধ্যমে রক্ত বেচাকেনা বন্ধ করতে হবে।

৩। একজন সুস্থ মানুষকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে উতসাহিত করতে হবে।

৪। রেডিও, টেলিভিশন নাটক পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন বিনোদনের মাধ্যমে জনগণকে এইডস এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

৫। পরিবার পরিকল্পনা কর্মীরা তাদের কার্যক্রমের সঙ্গে এইডস সম্পর্কিত তথ্য মানুষকে জানাতে পারে।

এইডস পরীক্ষা ঃ

রক্তের এইচআইভি পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা এইডস হয়েছে কিনা জানতে পারি। বিনামূল্যে রক্তের এইচআইভি পরীক্ষা করানো হয় এমন কিছু প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা দেওয়া হলো

১। ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক হেল্থ (আইপিএইচ), মহাখালী, ঢাকা
২। ভাইরোলজি ডিপার্টমেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনির্ভাসিটি (সাবেক পিজি হাসপাতাল), ঢাকা
৩। আর্মড ফোর্সেস ইনিষ্টিটিউট অব প্যাথোলজি, ঢাকা
৪। এমএজি মেডিকেল কলেজ, সিলেট
৫। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম
৬। খুলনা মেডিক্যাল কলেজ, খুলনা
৭। ভাইরোলজি ডিপার্টমেন্ট ইনষ্টিটিউট অব এপিডেমিওলোকিক্যাল ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ, মহাখালী, ঢাকা।

এইডস আক্রান্ত রোগীদের প্রতি আমাদের কর্তব্য ঃ

সমাজের প্রত্যেক মানুষের উচিত এইডস আক্রান্ত রোগীদের সঙ্গে সহানভূতিপূর্ণ আচরণ করা। এইডস আক্রান্ত রোগীকে অবহেলা না করে তার প্রতি স্নেহ মমতা ও ভালবাসা প্রদান করা যেন মানসিকভাবে সে একটু শান্তি পায়। কোন যৌনকর্মীর এইডস ধরা পড়লে তাকে অন্য কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া। এইডস আক্রান্ত স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া। রোগীর যেকোন প্রয়োজনে হলে এগিয়ে আসা। রোগীর জন্য সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

এইডস আক্রান্ত রোগীদের পালনীয় বিষয় ঃ

এখন পর্যন্ত এইডস রোগের পুরোপুরি চিকিৎসা আবিস্কৃত হয়নি। তবে কিছু কিছু নিয়ম কানুন মেনে চললে একজন এইডস রোগী অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারেন। যেমন–

১। পুষ্টিকর খাবার খাওয়া।
২। নিজেকে কর্মক্ষম রাখা নিয়মিত ব্যায়াম করা ও ঘুমানো।
৩। সম্ভব হলে চাকরি চালিয়ে যাওয়া।
৪। চিকিৎসকের নিকট কোনও কথা গোপান না করে সবকিছু খুলে বলা।
৫। মদ ও ধূমপান এড়িয়ে চলা।
৬। নিজেকে গুটিয়ে না রেখে সবার সঙ্গে মেলামেশা করা।
৭। রোগীদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা।

খ) পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ঃ

১. পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধারণা অর্জন ঃ

পরিবার পরিকল্পনা ঃ বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি 'ক্যাফেটারিয়া এ্যাপ্রোচ' আকারে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বহু রকমের পদ্ধতি দিয়ে থাকে। এসব ব্যবস্থা বা পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া যায় এমন পদ্ধতি (রিভারসিবল মেথড) এবং পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া যায় না এমন পদ্ধতি (ইরিভারসিবল মেথড); স্বল্প-মেয়াদী থেকে মধ্যম-মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতি; হরমোন জাতীয় পদ্ধতি, প্রতিবন্ধক পদ্ধতি এবং সনাতন পদ্ধতি।

৫০ বছরের কম বয়সী বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে বিভিন্ন গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের হার হচ্ছে-

ক. আধুনিক পদ্ধতিসমূহ	- ৩৬.২%
খ. সনাতন পদ্ধতিসমূহ	- ৮.৪%
গ. কোন পদ্ধতি ব্যবহার করছেন না	- ৫৫.৪%

[সূত্রঃ বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে ১৯৯৩-৯৪]

আধুনিক পদ্ধতিসমূহ হচ্ছে (ব্যবহারের আধিক্য অনুসারে):

ক. পিল বা খাবার বড়ি	- ৪৮.০%
খ. টিউবেকটমী বা মহিলা বন্ধ্যাকরণ	- ২২.৩%
গ. ইনজেকটেবল বা গর্ভনিরোধক ইনজেশন	- ১২.৪%
ঘ. কনডম	- ৮.৩%
ঙ. আই.ইউ.ডি	- ৬.০%
চ. ভ্যাসেকটমী বা পুরুষ বন্ধ্যাকরণ	- ৩.০%

সঠিকভাবে পদ্ধতি নির্বাচন ও ব্যবহার, পর্যাপ্ত ফলোআপ এবং বিভিন্ন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার সঠিক ব্যবস্থাপনার উপরই নির্ভর করে গর্ভনিরোধের বিভিন্ন পদ্ধতির সফল ব্যবহার।

২. পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে জানা ঃ

উদ্ভাবিত পদ্ধতিসমূহ হল ঃ

১. খাওয়ার বড়ি (ওরাল কনট্রাসেপটিভ পিলস)

২. ইনজেকটেবলস্

৩. কনডম

৪. ইনট্রা ইউটেরাইন ডিভাইস (আই.ইউ.ডি)

৫. স্বেচ্ছা বন্ধ্যাকরণ (পুরুষ বন্ধ্যাকরণ ভ্যাসেকটমী এবং নন-স্কালপেল ভ্যাসেকটমী, মহিলা বন্ধ্যাকরণ টিউবেকটমী)

৬. নরপ্যান্ট

৩. পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিগুলির সুফলতা ও জটিলতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ঃ

সুফলতা ও জটিলতা ঃ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নির্বাচনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে তা সুফল হয় এবং একই সাথে জটিলতা থেকে দূরে থাকা যায়। আলোচ্য ০৬টি পদ্ধতির মধ্যে রিভারসিবল মেথড এবং ইরিভারসিবল মেথড উভয়ই আছে। পদ্ধতি গ্রহণের পর তা ব্যবহারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তবে স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের আগে অবশ্যই ভাল করে পরবর্তী বিষয় সম্পর্কে জেনে নিতে হবে। যাতে নিঃসন্ধেহে একজন প্রশিক্ষিত চিকিৎসক সহযোগিতা করতে পারেন। এজন্য পরিবার পরিকল্পনার কাজে নিয়োজিত স্থানীয় মাঠকর্মীর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। আবার ইউনিয়ন বা উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত পরিবার পরিকল্পনা অফিসে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

গ) মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অন্যকে জানানো ঃ

অন্ততঃ ০২জন প্রতিবেশী অথবা দু'টি পরিবার এবং ঐ ০২জন বা দুটি পরিবার যেন আসক্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

✍ **"শিক্ষকতা ব্যাজ" অর্জন ঃ**

(সদস্য স্তর অর্জিত না হলে এই স্তরে অবশ্যই অর্জন করতে হবে।)

আত্ম উন্নয়ন ঃ স্বনির্ভর ব্যাজ ও স্কাউট কর্মী ব্যাজ অর্জন।

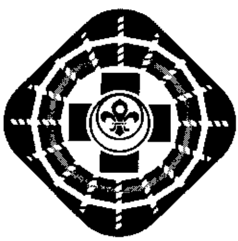

১৭. স্বনির্ভর ব্যাজ ও স্কাউট কর্মী ব্যাজ ঃ

এই ব্যাজ অর্জনের জন্য একজন রোভার স্কাউটকে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে।

১. সদস্য স্তরে উত্তীর্ন হওয়ার পর কাজ শুরু করতে হবে।

২. স্বনির্ভর ব্যাজগুলির মধ্য থেকে একটি বিষয় এবং স্কাউট কর্মী ব্যাজগুলির মধ্য থেকে একটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে।

৩. নির্বাচিত বিষয়গুলি ব্যক্তি জীবনে কি কাজে লাগবে তার উপর বিস্তারিত বিবরণ তৈরী করে ইউনিট কাউন্সিল, রোভার স্কাউট লিডার এবং জেলা রোভার স্কাউট কমিশনারের অনুমোদন নিয়ে ব্যাজ অর্জনের কাজ আরম্ভ করতে হবে।

৪. কাজ শুরুর সময় থেকে অনূন্য এক বছর ধরে কাজ করতে হবে।

৫. কাজ চলাকালীন সময়ে অন্ততঃ তিনবার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে ইউনিট কাউন্সিল, রোভার স্কাউট লিডার এবং জেলা রোভার স্কাউট লিডারকে অবহিত করতে হবে এবং তা কমপক্ষে দুবার পরিদর্শন করাতে হবে।

৬. কাজের অগ্রগতির জন্য কোন বিশেষজ্ঞের সহযোগিতার প্রয়োজন হলে নেয়া যাবে। অথবা প্রয়োজন হলে কোন প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা যাবে।

৭. কাজ শেষ হওয়ার পরবর্তী এক মাসের মধ্যে ইউনিট কাউন্সিল এবং রোভার স্কাউট লিডারের অনুমোদন সহকারে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট (লগবই) চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জেলা রোভার স্কাউট কমিশনারের নিকট পেশ করতে হবে।

স্তর উত্তীর্ণে করণীয় ঃ

- নির্ধারিত ২২টি ক্রু মিটিংয়ের অতিরিক্ত এক বা একাধিক বিশেষ ক্রু মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে। সেবা স্তরের রোভার স্কাউটকে বই পড়ে ও চর্চার মাধ্যমে বেশ কিছু বিষয় শিখতে হবে যা বিশেষ ক্রু মিটিংয়ে জানাতে ও প্রদর্শন করতে হবে।
- যে সকল বিষয় নিয়মিক ক্রু মিটিংয়ে জানার বা শেখার সুযোগ থাকবেনা এবং যে বিষয়গুলি ব্যক্তিগতভাবে শিখতে ও জানতে হবে শুধুমাত্র সেই বিষয়গুলির ভিত্তিতে বিশেষ ক্রু মিটিংয়ের আয়োজন করতে হয়।
- স্তর শেষ হওয়ার পর লিপিবদ্ধকৃত লগবই- এ অবশ্যই রোভার স্কাউট লিডার, জেলা রোভার স্কাউট লিডারের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট (পিআরএস) অ্যাওয়ার্ড ঃ

'পিআরএস' হল প্রতিটি রোভার স্কাউটের সর্বোচ্চ আরাধনা যা অর্জন করতে রোভাররা হয়ে থাকে ব্যাকুল। রোভারিং কার্যক্রমের ভিত্তিতে পিআরএস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির দুর্লভ সম্মান রোভারিং জীবনের স্বীকৃতি স্মারক হিসেবে কাজ করে এবং তা ভবিষ্যৎ জীবনে পথ চলতে অনুপ্রেরণা জোগায় অবিরাম।

মনে রাখতে হবে সকল কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরেও সামান্য অসচেতনতার জন্য অনেকেই অভীষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না। ফলে সমগ্র রোভারিং জীবনের লালিত স্বপ্ন নিমিষেই চূর্ণ হয়ে যায়। আর অনেকেই স্কাউটিংকে দোষারোপ করে 'আঙ্গুর ফল টক' প্রবাদের মতই। তাই এ সময় আরো বেশি বেশি করে কাজ শিখতে হবে যা পুনঃ আলোচনা হিসাবেই পরিগণিত হবে। জানতে হবে বাংলাদেশ স্কাউটসের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে। খবর রাখতে হবে বিশ্ব স্কাউটস আন্দোলন ও এর আঞ্চলিক কর্মকান্ড সম্পর্কে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্কাউটস ও ওয়ার্ল্ড স্কাউট ওয়েব সাইট-এর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। সেবা স্তরে উত্তীর্নের পর থেকে জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষার মধ্যবর্তী সময়ে অ্যাডভান্সড কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। অ্যাওয়ার্ড অর্জনের জন্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম 'রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম' বইয়ের (এপ্রিল ২০১০ সংস্করণ-এর) ৭৭ নং পৃষ্ঠায় সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হয়েছে।

লগবই ও নির্ধারিত ফরম ঃ

রোভারিং জীবনের প্রামাণ্য দলিল স্বরূপ "লগ বই" লেখা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে নৈপুণ্যতার স্বাক্ষর রাখতে হবে কারণ এর মাধ্যমেই সকল কার্যক্রম ফুটিয়ে তোলা যায়। খেয়াল রাখতে হবে যা লগ বইয়ে যোগ করা আবশ্যক তার কোন কিছুই যেন বাদ না যায়। অপ্রাসঙ্গিক কাগজ পত্রাদি যোগ করে লগ বই বেশি বড় করায় কোন যথার্থতা নেই। এর ফলে মূল্যায়ণকারীর নেতিবাচক দৃষ্টির আশঙ্কা রয়ে যায়। যাঁরা লগ বই পর্যালোচনা করেন তাঁরা খুবই দক্ষ এবং রোভারদের আপন মানুষ। বিশেষ করে বিগত বছরে যারা পি.আর.এস অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন তারাই লগ বই নিরীক্ষা করে থাকেন। তাই চিন্তার কিছু নেই। কারণ, তাঁরা অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের বর্তমান সময়ের চাপের কথা জানেন।

লগ বইয়ের সাথে বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক নির্ধারিত ফরমের ০৫ (পাঁচ) কপি যথাযথভাবে পূরণ করে ১ম কপি নিজের কাছে, ২য় কপি ইউনিটে, ৩য় কপি জেলায়, ৪র্থ কপি অঞ্চলে এবং ৫ম কপি জাতীয় সদর দফতরে লগবইয়ের সাথে প্রেরণ করতে হবে।

লগ বই ও সুপারিশ ফরম জমাদান ঃ

লগ বই ও নির্ধারিত সুপারিশ ফরম জমাদানের কোন নির্ধারিত সময় নেই । তবে জেলা পর্যায়ের পরীক্ষা সম্পাদন শেষে জানুয়ারি মাসের মধ্যে অঞ্চলে লগবই জমা দিলেই ভাল হয় । কারণ, অঞ্চল পর্যায়ের পরীক্ষা সাধারণত মার্চ/এপ্রিল এবং জাতীয় পর্যায়ে পরীক্ষা সাধারণত এপ্রিল/মে মাসে (পরিবর্তনীয়) অনুষ্ঠিত হয় । তবে বয়সের ক্ষেত্রে জেলায় জমাদানের তারিখই লক্ষ্যনীয় । রোভার, নৌ ও এয়ার অঞ্চলের রোভাররা ২৫ বছর এবং রেলওয়ে অঞ্চলের রোভার স্কাউটরা ৩০ বছরের মধ্যে জেলায় লগবই জমাদান প্রক্রিয়া সমাপ্ত করবে । মনে রাখতে হবে প্রতিটি স্তরে উল্লেখিত সময় সর্বনিম্ন । তবে কোন কোন কাজ সমাপ্ত না হলে স্তরের সময়সীমা বাড়তে পারে । স্তর ভিত্তিক সকল কাজ নির্দিষ্ট সময়ের (অঞ্চলভেদে ২০-২৫ বছরের) মধ্যে সম্পন্ন করলেই তা সঙ্গত বলেই ধরে নেওয়া হয় ।

পিআরএস অ্যাওয়ার্ড অনুমোদন ঃ

একজন রোভার স্কাউটকে চার স্তরের মূল্যায়ণে অবতীর্ণ হতে হয় । প্রথমটি ইউনিট/গ্রুপে, দ্বিতীয়টি জেলায়, তৃতীয়টি অঞ্চলে এবং চতুর্থ ও চূড়ান্ত মূল্যায়ণ জাতীয় পর্যায়ে । পর্যায়ক্রমে সকল পর্যায়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও সাফল্য অর্জন করে কেবলমাত্র জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রোভার স্কাউটরা পিআরএস অ্যাওয়ার্ড অর্জনের গৌরব লাভ করে ।

নমুনা ক্রু-মিটিং

ক্রু-মিটিং নং	কাজ	বিশেষ কাজ
০১		
০২		
০৩		
০৪		
০৫		
০৬		
০৭		
০৮		
০৯		
১০		
১১		
১২		
১৩		
১৪		
১৫		
১৬		
১৭		
১৮		
১৯		
২০		
২১		
২২		
২৩		
২৪		
২৫		
২৬		
২৭		
২৮		
২৯		
৩০		
বিশেষ ক্রু-মিটিং		

এক নজরে 'সেবা স্তর' প্রোগ্রাম

পর্যায়/স্তর বিষয়	সেবা স্তর
বিশেষ জ্ঞান	০১. সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ০২. বাংলাদেশের যে কোন একটি বিভাগের গঠন প্রণালী ও কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০৩. বাংলাদেশে জাতিসংঘ ও এর শাখা সমূহের কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ০৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও একটি আন্তর্জাতিক যুব সংস্থার কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ০৫. সার্ক সহ অন্য কোন একটি আঞ্চলিক জোটের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ০৬. এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওন ছাড়া বিশ্ব স্কাউট সংস্থাভূক্ত ২টি অঞ্চলের স্কাউটিং আছে এমন ২টি দেশের ইতিহাস, কৃষ্টি, ভাষা, যোগাযোগ, খাদ্য ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।
ব্যবহারিক কাজ	০৭. রেকর্ড সংরক্ষণ ঃ ক) আমার স্কাউট রেকর্ড বই সংরক্ষণ করা। খ) লগ বই লিপিবদ্ধ করা। ০৮. ব্যবহারিক দক্ষতা ঃ ক) কমপক্ষে ২টি পাইওনিয়ারিং প্রজেক্ট তৈরী করা (পূর্বের ২টি ব্যতিত)। খ) বিশ্ব বন্ধুত্ব কার্যক্রম। গ) ১ টি এলাকা জরীপ করে রিপোর্ট প্রনয়ন করা। ০৯. "পরিভ্রমণকারী ব্যাজ" অর্জন ১০. কম্পিউটারে স্প্রেড সীট তৈরী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ১১. যে কোন একটি বিষয়ে পরিমিত জ্ঞানার্জন ঃ ব্লাড ব্যাংক, চু ব্যাংক, চু শিবির, কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ, বৈমানিক, নাবিক, রেলওয়ে পাইলট।
ধর্মীয় কার্যাবলী	১২. স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনের প্রতি দৃষ্টি রেখে ধর্মীয় অনুশাসন সমূহ মেনে চলা ও অপরকে উদ্বুদ্ধ করা।
আন্দোলনের সেবা	১৩. স্কাউটিং ও সেবা কার্যক্রম ঃ ক) ১টি কাব ও ১টি স্কাউট দল পরিদর্শন করে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রণয়ন। খ) পি.আর.এস-দের নাম ও তথ্য জানা গ) শাপলা কাব/পি.এস তৈরীতে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান। ঘ) অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন।
সমাজ সেবা/সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য	১৪. সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন ঃ ক) পরিবেশ সংরক্ষণে জনসাধারনকে উদ্বুদ্ধ করণের জন্য দুটি তথ্যবহুল চার্ট প্রস্তুত করে প্রদর্শন ও প্রচার করা। খ) পূর্বের রোপনকৃত ৪টি বৃক্ষের পরিচর্যা ও প্রতিবেদন পেশ। ১৫. স্বাস্থ্য পরিচর্যা ঃ ক) হেপাটাইটিস-বি ও সি ভাইরাস এবং এইডস্ রোগ সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞানার্জন। খ) পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। গ) মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অন্যকে জানানো। ▶▶ "শিক্ষকতা ব্যাজ" অর্জন। (সদস্য স্তরে অর্জিত না হলে এই স্তরে অবশ্যই অর্জন করতে হবে)
আত্ম উন্নয়ন	১৬. নিচের যে কোন একটি বিষয়ে "স্বনির্ভর ব্যাজ" অর্জন (অন্ততঃ এক বছর)। [কাজ শেষ না হলে চলবে] ঃ কম্পিউটার, পোলট্রি ও মৎস্য চাষ, ডেইরি ফার্ম, সেলাই কাজ (সেলাই, ব্লক, বাটিক, এমব্রয়ডারী) বউটিশিয়ান, পর্যটন কর্মি, আলোকচিত্র শিল্পী, সেটেলাইট ও টেলিকমিউনিকেশন, সাংবাদিকতা, নার্সারী ইন্টেরিয়র ডিজাইন, শিল্পকলা (সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্য), চিত্র ও কারুশিল্প, সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স ইত্যাদি। ১৭. নিচের যে কোন একটি বিষয়ে "স্কাউট কর্মী ব্যাজ" অর্জন [কাজ শেষ না হলে চলবে] ঃ প্রাথমিক প্রতিবিধান, পাইওনিয়ারিং, সিগনালিং, উদ্ধার কর্মি, হেলথ মোটিভেটর ইত্যাদি।
সময়সীমা	০৬-০৯ মাস
ক্রমিটিং(নূন্যতম)	২২টি
উত্তীর্ণ	প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট (পি.আর.এস.) অ্যাওয়ার্ড

তথ্যসূত্রঃ

১. রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম (নতুন ও পুরাতন সংস্করণ)

২. সেবা স্তর বই (পুরাতন সংস্করণ)

৩. বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক প্রকাশিত 'স্কাউট গান'-এর সিডি

৪. www.scout.org

৫. http://en.wikipedia.org/wiki

৬. স্বাস্থ্য সেবায় রেফারেন্সস ম্যানুয়াল (ইউনিয়ন পর্যায়ের জন্য)

৭. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন (২০০৭-২০০৮)

৮. বিভিন্ন ওয়েব সাইট।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ঃ

১. প্রফেসর মো. আব্দুল মজিদ, এলটি, রোভার অঞ্চল।

২. জনাব মো. হামিদুল হক, এএলটি, রোভার অঞ্চল।

৩. প্রফেসর মো. শরিফুল ইসলাম খান, এনটিসি সম্পন্নকারী, রোভার অঞ্চল।

৪. জনাব মো. মোয়াজ্জেম হোসেন, সিএএলটি সম্পন্নকারী, রোভার অঞ্চল।